মাসিক

আলোকধারা

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং-২৭২
২২ তম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল ২০১৬ ঈসায়ী

বাংলা নববর্ষে জাগ্রত হোক শুভবোধ

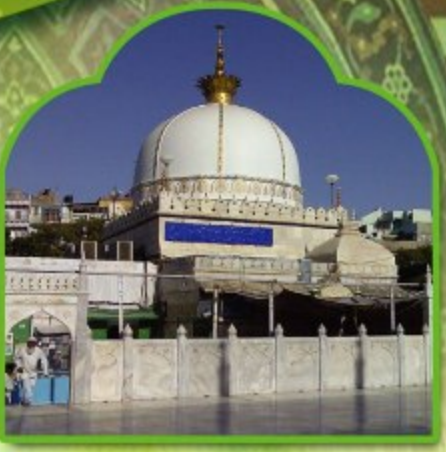

- নবীপ্রেমিক হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.)
- হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (রহ.)-এর সূফী দর্শন
- দিওয়ানে মঈনুদ্দিনের আলোকে হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম

ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে মাইজভাণ্ডারী একাডেমী আয়োজিত দু'দিনব্যাপী ৫ম জাতীয় সুফি সম্মেলন ২০১৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী।

সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ 'তাসাউফ'-এর মোড়ক উন্মোচন পর্ব।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল।

মাসিক
আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ২১তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

এপ্রিল- ২০১৬ ঈসায়ী
জমাঃ সানী-রজব - ১৪৩৭ হিজরি
চৈত্র-বৈশাখ - ১৪২২-২৩ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

যোগাযোগ:
লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web:www.sufimaizbhandari.org
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়:
বাংলা নববর্ষ ও শুভ জীবনবোধ ---------- ২

■ রুকু যাওয়ার সময় রফে ইয়াদাইন না করা তথা হাত না উঠানো: সুন্নাত সহীহা
– ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ ---------- ৩

■ নবীপ্রেমিক হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.)
– মাওলানা নেজাম উদ্দীন চিশ্‌তী ---------- ১১

■ দিওয়ানে মঈনুদ্দিনের আলোকে হযরত বাবাভাণ্ডারী কেবলা আলম
– অধ্যাপক জহুরুল আলম ---------- ১৬

■ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (রহ.) এর সূফী দর্শন
– অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ১৮

■ বাঙালির নববর্ষ
– আলোকধারা ডেস্ক ---------- ২১

■ তাওহীদের সূর্য :
মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে
– জাবেদ বিন আলম ---------- ২৩

■ তাসাউফ সাহিত্যে ব্যবহৃত চল্লিশ হাদিস ও প্রাসঙ্গিকী
– অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী -- ২৯

■ মর্যাদা ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে পরিশুদ্ধ অন্তর
– মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার ---------- ৩৪

■ সাধনের কায়দা জানা চাই, বেকায়দায় করলে সাধন মাওলা রাজি নাই
'সবর ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রসঙ্গ'
– মাওলানা কাজী মোহাম্মদ হাবিবুল হোসাইন ---------- ৩৬

■ শাহানশাহ্ জীবনী শরিফের পাঠ এবং জামাল আহমদ সিকদার
– বদরুন্নেসা সাজু ---------- ৩৮

■ বায়াত গ্রহণে নবী করীম (দ.) এর উত্তরাধিকারীর শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য
– মাওলানা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আযহারী ---------- ৪১

■ সাংগঠনিক কার্যক্রম ---------- ৪৭

■ মার্চ মাসের নিউজপুল থেকে ---------- ৪৮

সম্পাদকীয়...

বাংলা নববর্ষ ও শুভ জীবনবোধ

আর মাত্র ১৩ দিন পরেই ১৪ই এপ্রিল আমরা পেতে যাচ্ছি আরেকটি বাংলা নববর্ষ। শুভ ১৪২৩ বাংলা সাল। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। বৈশাখ আমাদের জীবনে এক নববোধের উদ্বোধন ঘটায়। এসময় আমরা প্রকৃতিতে দেখি শক্তির রুদ্র ও সৌম্য রূপ। এটা আমাদের চরিত্রকে দেয় দৃঢ়তার সবক, প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে মনে যোগায় সাহস, অভিব্যক্তিতে দেয় মূঢ়তা পরিহারের প্রেরণা। এদিন আমরা উৎসবে মেতে উঠি। আনন্দ জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কিন্তু নিরন্তর সংগ্রামই জীবনের মূল চালিকাশক্তি। সংগ্রামের মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত না হলে জীবন হতো একপেশে। এ বোধ থেকেই বিনোদনের জাগৃতি। কিন্তু শুধু বিনোদন মানুষকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না। তাই বিনোদনের সময় বিবেচনাবোধকে জাগ্রত রাখতে হয়। বিবেচনাহীন বিনোদন জীবনের কলুষতাকে অপনোদন করতে পারে না। আমরা বিগত-প্রায় (১৪২২ বাংলা) নববর্ষের ১ম দিনে দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিবেচনাহীনতার এক ন্যাক্কারজনক উদাহরণ প্রত্যক্ষ করেছি। সে ঘটনা আমাদের জাতিগত শুভবোধকে দারুণভাবে আহত ও ভূলুণ্ঠিত করেছে। কোনভাবেই আমরা এর পুনরাবৃত্তি চাই না। আমাদের সংস্কৃতিতে একটি স্থির-বিশ্বাস সর্বদা ক্রিয়াশীল। সে স্থির বিশ্বাসটি হচ্ছে তওহীদ। এ বিশ্বাসের দাবি হচ্ছে অশ্লীলতা-মুক্ত একটি নৈতিকতাবোধ অর্জন ও তার ধারাবাহিক চর্চা। বর্তমানে সারাবিশ্বব্যাপী অশ্লীলতা ও দুর্নীতি মানবজাতির জন্য এক সর্বগ্রাসী ও মারাত্মক সমস্যা। সুস্থ একটি সংস্কৃতিবোধ ও তার চর্চা আমাদেরকে অশ্লীলতা ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে। আমরা কোন ভূঁইফোড় জাতি নই। আমাদের জাতিসত্তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। আমাদের বাহ্যিক চাহিদা ও আত্মিক প্রয়োজনের মাঝে মেলবন্ধন ঘটিয়েই জীবনযাপন করতে হয়। আমাদের জাতির মানস নির্মাণের কারিগররা সে সবক আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা শুধু বৈষয়িক শিক্ষাই পাইনি, পেয়েছি আধ্যাত্মিক শিক্ষাও। মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব জীব নয় তার রূহানী চাহিদাও রয়েছে। আল্লাহর মহান অলিগণ আমাদের জীবনে রূহানী খোরাকের যোগানদার। আমাদের জাতীয় জীবনে আধ্যাত্মিক সাধকদের উপস্থিতি একটি বাস্তব সত্য যাকে কিছুতেই অবজ্ঞা করা যায় না। আমাদের জন-জীবনে ও সংস্কৃতিতে তাঁদের প্রভাব খুবই প্রবল। তাঁদের প্রভাব দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ থাকে না। সীমাবদ্ধ থাকে না কোন নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও। কালের হয়েও তাঁরা হন সর্বকালের এবং কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করেও তাঁরা হয়ে পড়েন সর্বজনীন। তাঁদের স্মৃতিচারণের মধ্যে আমরা আমাদের অস্তিত্বের প্রবহমানতার প্রাণরস খুঁজে পাই। তাঁরাই ঘটিয়েছেন আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও জাগৃতি। সৌভাগ্যবশত এ মাসে আমরা তেমন কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে স্মরণের সুযোগ পাচ্ছি। তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন মহানবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মহান সাহাবী ও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)। ২২শে জমাদিউসসানী (১ এপ্রিল ২০১৬) তাঁর ইনতিকাল বার্ষিকী। পাশাপাশি যথাক্রমে ৯-১৪ এপ্রিল (১-৬ রজব) এবং ৫এপ্রিল (২২ চৈত্র) অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপমহাদেশের দু'জন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) ও কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (রহ.) এর বার্ষিক উরস শরীফ। তাঁদের উরস অনুষ্ঠানকে ঘিরে অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত অনুসারী অনুরাগী মেতে উঠবেন নবতম আনন্দ ও আত্মিক চেতনায়। আমরা এ তিন মহান ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পুরুষের স্মৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা পেশ করছি এবং প্রত্যাশা করছি তাঁদের রূহানী ফয়েজ ও বরকতের। তাঁদের আধ্যাত্মিক নজর ও করমে আমাদের জীবনে জাগ্রত হোক শুভ বিবেচনাবোধ।

রুকু যাওয়ার সময় রফে ইয়াদাইন না করা তথা হাত না উঠানো : সুন্নাত সহীহা

• ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ •

[**প্রতিপাদ্যসার:** নামাযে তাকবীরে তাহরীমায় হাত উঠানো সুন্নাত। তবে এ ছাড়া নামাযের অন্য কোন স্থানে হাত না উঠানো সুন্নাত সহীহা। এটি ইমাম আবূ হানীফা (ওফাত. ১৫০হি.) ও ইমাম মালিকের (ওফাত ১৭৯হি.) অভিমত। সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে তাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম আবূ হানীফা তাবেঈ অন্তর্ভুক্ত। তিনি বিশ জনের অধিক সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহর সুন্নাত সম্পর্কে তাঁর যা জানা থাকা সম্ভব ছিল, অন্য ইমামের পক্ষে ততটুকু সম্ভব ছিলনা। তিনি জীবনে পঞ্চান্নবার হজ করেছেন। জীবনের প্রায় ১২ বছরের অধিক সময় মক্কা ও মদীনা শরীফে অতিবাহিত করেছেন। সে সময়ে ইসলামের দারুল খিলাফাত ছিল কূফায়। সেখানে তাঁর জন্ম। যেখানে হাজার হাজার সাহাবী হিজরত করেছিলেন। তিনি এসব সাহাবীর আমল স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। নামায এমন একটি আমল যা দৈনিক পাঁচ বার আদায় করা ফরয। সাহাবীরা দৈনিক পাঁচবার কীরূপে নামায পড়েছেন তিনি তা দেখেছেন। এরপরও যদি কেউ বলে তাঁর কাছে সহীহ হাদীস পৌঁছেনি, তা নিতান্ত অসত্য কথা। আজ চৌদ্দশত বছর পর নাসির উদ্দিন আলবানী (মৃত.১৪২০হি.) 'রাসূলুল্লাহর নামায' নামে একটি বই লিখে মুসলমানদের এ অন্যতম প্রধান ইবাদতকে কলুষিত করেছে। পূর্বের ইমামরা রাসূলুল্লাহর সহীহ হাদীস পাননি। আর চৌদ্দশত বছর পর তিনি সহীহ হাদীসের সন্ধান পেয়েছেন! নাউযুবিল্লাহ। আমাদের কিছু ভাই বিচার বিশ্লেষণ না করে আলবানীকে অনুসরণ করা শুরু করেছে। তাই এ প্রবন্ধে বিষয়টি সহীহ হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হল।]

ভূমিকা: নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো সুন্নাত। এ বিষয়ে অনেক সাহাবীর হাদীস ও মুজতাহিদদের ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময়, তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠার পর, সিজদায় যাওয়ার সময় এবং দু সিজদার মাঝে হাত উঠানো নিয়ে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ রফে ইয়াদাইন করাকে উত্তম এবং কেউ কেউ না করাকে উত্তম মনে করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, হযরত বারা ইবন আযিব, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক, হযরত উমার ফারূক, হযরত আলী, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমার, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, হযরত আব্বাস ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, অনেক তাবেঈ, অনেক ফুকাহা এবং মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আবূ ইউসূফ এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এর মতে নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠানো উচিত নয়।

এ মতবিরোধের ভিত্তি হল এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দু ধরণের হাদীস পাওয়া যায়। কোন কোন হাদীসে আছে যে তিনি রুকু যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠিয়েছেন। আবার কোন কোন হাদীসে আছে তিনি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোথাও হাত উঠান নি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও ইমাম শাফেঈর মতে রফে ইয়াদাইন করা উত্তম। রফে ইয়াদাইন করার হাদীস তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। বিধায় তারা রফে ইয়াদাইন করার প্রতি রায় দিয়েছেন। তাই তাদের অনুসারীরা এর উপর আমল করছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকের (রহ.) মতে রফে ইয়াদাইন না করার হাদীস বেশি গ্রহণযোগ্য। তাই তারা রফে ইয়াদাইন না করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এ কারণে এ দু মাযহাবের অনুসরীরা রফে ইয়াদাইন করেন না। এটি একটি ফিকহী মাসয়ালা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামার কাছে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। এক পক্ষের লোক অন্য পক্ষের লোককে হাদীস বিরোধী বা হাদীস অস্বীকারকারী বলে কটূক্তি করেন না।

বারশ শতাব্দী পর্যন্ত এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে ইখতিলাফ থাকলেও চার মাযহাবের ইমাম ও অনুসারীদের মধ্যে কোন অশোভন আচরণ দেখা যায়নি। তাদের সকলে চেষ্টা করেছেন রাসূলুল্লাহর বিশুদ্ধ হাদীস ও সর্বশেষ কথার উপর আমল করতে।

কিন্তু বারশ শতাব্দীতে মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব আন নজদী (মৃত.১২০৬) এর ফিতনা ইসলামের ইতিহাসে দানা বাঁধে। তিনি হারামাইন শরীফাইন মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের অসংখ্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম ও অনুসারীদের শহীদ করেন। তাওহীদের নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শান মানে এবং আউলিয়া কেরামের উপর হামলা করেন। কা'বা গৃহে চার মাযহাবের জন্য চারটি মসল্লাহ্ ছিল। সবাই নিজ নিজ মযহাব অনুযায়ী আমল করত। সবাই একে অপরকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব নজদী সেসব মসল্লাহ উঠিয়ে দিয়ে ওয়াহাবী মাযহাব অনুযায়ী আমল প্রচলন করলেন। যদিও তিনি বাইরে নিজেকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলতেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি কোন মাযহাব অনুসরণ করাকে শিরক মনে করতেন। তার এ আকীদা বিশ্বাসের উপর তিনি 'কিতাবুত তাওহীদ' রচনা করেন। উল্লেখ্য, তার পিতা আব্দুল ওয়াহাব ও তার ভাই সোলাইমান ইবন আবুদল ওয়াহাব তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কেননা, তারা দুজনই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন। তারা মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাবের বিরুদ্ধে 'আস সাওয়ায়েকুল মুহরেকা ফি রদ্দে আলাল ওয়াহাবীয়া' নামক একটি ঐতিহাসিক কিতাব রচনা করে তার গোমর ফাঁস করে দেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের অনুসারীরা নিজেদেরকে লামাযহাবী, কখনো আহলে হাদীস, আবার সালাফী পরিচয় দিতে শুরু করে। তবে সাধারণ মুসলমানদের কাছে তারা মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাবের নামে 'ওয়াহাবী' হিসেবে পরিচিত।

এ ওয়াহাবী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাবের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও আকীদা বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচার করা। বিশ্বের মুসলমানদেরকে আহলে সুন্নাত থেকে বের করে ওয়াহাবী মতবাদের অনুসারী করা। এরা ইসলামের প্রসিদ্ধ চার মাযহাব (হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদেরকে গোমরাহ ফিরকা বলে প্রচার করে। তারা তাদের আন্দোলনে প্রধান লক্ষ্যস্থির করে স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরকে। তাদের হাতে কয়েক পৃষ্ঠার কিছু বই তুলে দিয়ে বলে, এসব সুন্নাত সহীহা আর বাকী সবই সুন্নাহবিরোধী। নাউযুবিল্লাহ। প্রবন্ধে আমরা রফে ইয়াদাইন বিষয়ে রাসূলুল্লাহর হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করে এবং প্রথম সারির সাহাবীদের আমল উপস্থাপন করে প্রমাণ করব যে, হানাফী মাযহাবই সুন্নাতে সহীহার উপর প্রতিষ্ঠিত।

রফে ইয়াদাইন না করাই সুন্নাত সহীহা:

তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন সময় হাত না উঠার উপর যেসব হাদীস রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদীস:

قال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ولايعود (مسند ابى حنيفة' رقم الحديث–97)

অর্থ-ইমাম আবূ হানীফা বর্ণনা করেন, তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত হাম্মাদ, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদ থেকে, তাঁরা হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দু হাত কেবল নামাযের শুরুতেই উঠাতেন; হাত উঠানোর কাজ নামাযে আর করতেন না।

হাদীসটি আরো অনেক সনদে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এক. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইবন আবি শায়বা তাঁর মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ২৪২১। দুই. ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৭৪৮। তিন. ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাদীসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন-

حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثورى واهل الكوفة

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রা.) এর হাদীসটি হাসান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অনেক সাহাবী ও তাবেঈ এ মতের অনুসারী। সুফিয়ান সাওরী ও আহলে কূফার মাযহাব এরূপ।

চার. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে সুগরায় বর্ণনা করেন, হাদীস নং-১০৫৮। পাঁচ. হাদীসটি ইমাম বুখারীর উস্তাদ মুহাদ্দিস আব্দুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ২৫৩৩। ছয়. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং-৪২১১। সাত. ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে কুবরায় বর্ণনা করেছেন, হাদীস

নং-৬৪৯। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় হাত না উঠানো বিষয়ক হযরত ইবনে মাসউদের এ হাদীস অসংখ্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় হাদীস:

قال ابو حنيفة يقول الشعبي سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح يديه حتى يحاذى منكبيه ولا يعود برفعهما حتى يسلم من صلاته (مسند ابى حنيفة)

অর্থ-ইমাম আবূ হানীফা রহ. বর্ণনা করেন, হযরত শা'বী বলেন, আমি বারা ইবন আযেব (রা.)কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যখন নামায শুরু করতেন তখন দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। নামাযে সালাম ফিরানো পর্যন্ত আর দ্বিতীয় বার হাত উঠাতেন না।

এ হাদীসটি অন্য যেসব কিতাবে উল্লেখ রয়েছে- এক. মুসনাদে আবি নাঈম পৃ.১৫৬। দুই. মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল খ.৪র্থ পৃ.৩০১। তিন. সুনানে নাসাঈ খ.২য় পৃ.১৯৫। চার. সুনানে আবূ দাউদ খ.১ম পৃ.২৮১ হাদীস নং ৭৫০। পাঁচ. মুসান্নাফে ইবন আবি শায়বা খ.১ম পৃ.২৬৪। ছয়. মুসনাদে আবি ইয়ালা হাদীস নং ১৬৫৩।

তৃতীয় হাদীস:

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وما بعد ما يرفع راسه من الركوع لايرفعهما (مستخرج ابى عوانه رقم الحديث 1251)

অর্থ-সুফিয়ান ইবন উয়াইনা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি যুহরী থেকে, তিনি সালেম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেখেছি যখন তিনি নামায শুরু করেন তখন তিনি তাঁর দু' হাত উত্তোলন করেন এ পর্যন্ত যে, তিনি হাতদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করেন। আর যখন তিনি রুকু করেন এবং রুকু থেকে উঠেন তখন তিনি তাঁর হাতদ্বয় উত্তোলন করতেন না।

এ হাদীসটি ইমাম বুখারীর উস্তাদ হুমাইদীর মুসনাদেও বর্ণিত হয়েছে হাদীস নং-৬২৬। এছাড়া এ হাদীসটি মুসান্নাফে আবি শায়বার মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে, হাদীস নং-২৪৫০।

চতুর্থ হাদীস:

باب من لم يذكر الرفع عند الركوع- عن ابى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل فى الصلاة رفع يديه مدا (أبو داؤد، سننه)

অর্থ: রুকুর সময় হাত না উঠানোর অধ্যায়ে ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যখন নামায শুরু করতেন, তখন হাত উঠাতেন।

পঞ্চম হাদীস:

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة (سنن ابى داؤد رقم الحديث- 784، جامع ترمذى رقم الحديث- 257 وسنن النسائى-رقم الحديث 1026)

অর্থ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যেভাবে নামায পড়েছেন সেভাবে কি আমি তোমাদেরকে নামায পড়াব না? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন; তিনি নামাযে কেবল একবার হাত উঠালেন।

ষষ্ঠ হাদীস:

عن عباد بن زبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه فى اول الصلاة ثم لايرفعهما فى شئ حتى يفرغ (نصب الراية، امام الزيلعى، 404/1)

অর্থ-হযরত আব্বাদ ইবন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যখন নামায শুরু করতেন তখন নামাযের শুরুতে দু' হাত উঠাতেন, অতঃপর নামায শেষ না হাওয়া পর্যন্ত আর হাত উঠাতেন না।

সপ্তম হাদীস:

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعى ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا فى الصلاة (صحيح مسلم باب الامر بالسكون، رقم الحديث 996)

অর্থ-হযরত জাবের ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাদের দিকে বের হলেন। তিনি বললেন, আমি কেন দেখছি যে, তোমরা নামাযে অস্থির ঘোড়ার লেজের ন্যায় বার বার হাত উঠাচ্ছ। বরং তোমরা নামাযে স্থির ও শান্ত থাক।

এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং-১১৯৩। ইমাম ইবন আবি শায়বা ও আব্দুর রাযযাক তাদের মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অস্থির ঘোড়ার লেজের ন্যায় নামাযে হাত উঠানামা করতে নিষেধ করেছেন। বরং তিনি নামাযে শান্ত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টরূপে নামাযে সুকুন থাকার (হাত নড়া চড়া না করার) হুকুম দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে, সিজদায় যেতে, যেখানে যেখানে আল্লাহু আকবর বলা হয় সেখানে হাত উঠা নামা না করার জন্য বলা হয়েছে। যতদিন রাসূলুল্লাহ সাহাবীদেরকে হাত না উঠাতে নিষেধ করেননি ততদিন তারা হাত উঠিয়েছেন। নিষেধ করার পর তারা আর হাত উঠাননি।

অষ্টম হাদীস:

محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (صحيح البخارى، باب سنة الجلوس في التشهد رقم الحديث828)

অর্থ-হযরত মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন আতা সাহাবীদের একটি জামাতে বসেছিলেন। সেখানে সাহাবীরা নামায নিয়ে আলোচনা করেন। হযরত আবু হামীদ সাঈদী (রা.) বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামায বেশি সংরক্ষণকারী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দু হাত কানের লতি বরাবর নিয়ে গেলেন। যখন রুকু করলেন দু হাত হাটুর উপর নিয়ে রাখলেন। তাঁর পিঠ ঝোকালেন। রুকু থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন। হাড়ের প্রত্যেক জোড়া আপন স্থানে চলে আসল। অতঃপর সিজদা করলেন এবং দু হাত মাটিতে রাখলেন। হাতকে পূর্ণ প্রসারিত করলেন না। পায়ের আঙ্গুলকে কিবলামুখী করে রাখলেন। অতঃপর যখন দু রাকাতের মাঝে বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখলেন।

বুখারী শরীফের উপরিউক্ত হাদীসে আছে- এক সাহাবী হযরত আবূ হামীদ সাঈদী (রা.)কে একদল সাহাবীর সামনে বললেন, আমি আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাসূলুল্লাহর নামায সংরক্ষণকারী। আর একদল সাহাবী তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর নামাযের তরীকা বর্ণনা করলেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যানুযায়ী রাসূলুল্লাহ কেবল তাকবীরে তাহরীমায় হাত উঠিয়েছেন। রুকুতে যাওয়ার সময় কিংবা উঠার সময় রাসূলুল্লাহ হাত উঠাননি। এভাবে পুরো নামাযের বিবরণ দেয়ার পর কোন সাহাবী তার বিরোধিতা করলেন না। এতে কি প্রমাণিত হয় না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর দ্বিতীয় বার হাত উঠাতেন না?

নবম হাদীস:

عن عمرة قالت – سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا توضأ فوضع يديه سمى الله. ويسبغ الوضوء. ثم يقول مستقبل القبلة. فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه. ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه. ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا. ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت. ثم يرفع رأسة فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر (سنن ابن ماجه، باب اتمام الصلاة رقم الحديث 1062)

অর্থ: হযরত আমরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা.)কে প্রশ্ন করলাম যে, রাসূলুল্লাহ কীভাবে নামায পড়তেন। উত্তরে হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, তিনি যখন অযু করতেন তখন আল্লাহ তাআলার নাম নিতেন। অযু পরিপূর্ণরূপে করতেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবর বলে দু' হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধতেন। অতঃপর রুকু করতেন। রুকুতে তিনি তাঁর হাটুর উপর দু'হাত রাখতেন এবং বাহু দু'টি প্রসারিত করতেন। অতঃপর দাঁড়াতেন এবং মেরুদন্ড সোজা করতেন। তিনি এমনভাবে দাঁড়াতেন যা তোমাদের দাঁড়ানোর চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ। অতঃপর সিজদা করতেন। সিজদায় দু' হাত

কেবলামুখী করে বাহু দু'টি সম্ভব অনুযায়ী প্রসারিত করতেন, যা আমি দেখেছি। অতঃপর মাথা উঠাতেন এবং বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি বাম দিকে ঝুঁকতে অপছন্দ করতেন।

হযরত আয়িশা (রা.) এর হাদীসেও রুকুতে যাওয়ার সময় কিংবা রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানোর কথা নেই।

দশম হাদীস:

أن أبا مالك الأشعرى جمع قومه فقال : يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نسائكم وأبناهم أعلمكم صلاة النبى صلى الله عليه و سلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نسائهم وأبنائهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء الى أماكنه حتى لما أن فاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال فى أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما. (مسند أحمد، رقم الحديث 22957)

অর্থ-হযরত আবূ মালিক আশয়ারী (রা.) তাঁর সম্প্রদায়কে একত্রিত করে বললেন, হে আশয়ারী সম্প্রদায়! তোমরা একত্রিত হও এবং তোমাদের নারী ও ছেলেদেরকেও একত্রিত কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাদেরকে মদীনা শরীফে যে নামায পড়িয়েছেন, আমি তোমাদেরকে সে নামায শিক্ষা দেব। তারাও একত্রিত হল এবং তাদের নারী ও ছেলেদের একত্রিত করল। অতঃপর তিনি অযু করলেন এবং দেখালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কীভাবে অযু করতেন। নির্দিষ্ট স্থানসমূহে অযু শেষ করে যখন সূর্যের আসলী ছায়া অতিবাহিত হল এবং ছায়া লম্বা হল তিনি দাঁড়ালেন এবং আযান দিলেন। প্রথমে পুরুষদের কাতার পরে ছেলেদের কাতার এবং তাদের পিছনে মেয়েদের কাতার করলেন। অতঃপর ইকামত হল। অতঃপর দু'হাত তুলে তিনি তাকবীর পড়লেন। আর সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা নিম্নস্বরে তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর তাকবীর দিলেন এবং রুকু করলেন। রুকুতে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি তিন বার পড়লেন। অতঃপর সামিয়াল্লাহু লিমান হামীদা বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীর দিলেন এবং সিজদা করলেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে মাথা উঠালেন এবং আবার তাকবীর দিয়ে সিজদা করলেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

হযরত আবূ মালিক আশয়ারী অনেক সাহাবীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নামায আদায় করলেন। সকলেই তা মেনে নিল। কেউ আপত্তি করল না। অথচ এ হাদীস অনুযায়ী তিনি রাফে ইয়াদাইন করেন নি। এরপরও হানাফীরা হাদীস মানে না, বলা ঠিক হবে? আমরাতো মনে করি যারা রফে ইয়াদাইন করেন তারা হাদীসের দোহাই দিয়ে ভুল করছেন।

হাত না উঠানোর উপর সাহাবীদের আমল:

খোলাফায়ে রাশেদীন রফে ইয়াদাইন করতেন না

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) এর পিছনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) নামায পড়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন হযরত আবূ বাকর সিদ্দিক (রা.) কেবল তাকবীরে তাহরীমায় হাত উঠিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বর্ণনা করেন আমি হযরত উমর (রা.) এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনি কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযে হাত উঠাতেন। ইরশাদ হয়েছে-

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع ابى بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند التكبيرة الاولى فى افتتاح الصلاة (سنن الدار قطنى رقم الحديث 1144)

অর্থ-হযরত ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এর সাথে নামায আদায় করেছি; তারা কেউ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযে আর কোথাও হাত উঠাতেন না।

হযরত আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)কে নামায পড়তে দেখেছি, তিনি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া দ্বিতীয়বার নামাযে হাত উঠাতেন না।

হযরত আলী (রা.) রাফে ইয়াদাইন করতেন না

হযরত আলী (রা.) এর সাথীদের একজন কুলাইব আল জারমী (রা.) বর্ণনা করেন আমি হযরত আলী (রা.) কে নামায পড়তে দেখেছি যে, তিনি কেবল তাকবীরে তাহরীমার

সময় হাত উঠাতেন। পুরো নামাযে এরূপ আর করতেন না। বর্ণিত হয়েছে-

ان علیا رضی الله عنه کان یرفع یدیه فی التکبیرة الاولی التی یفتتح بها الصلاة ثم لایرفعهما فی شیٔ من الصلاة (موطا الامام مالک رقم الحدیث 109)

অর্থ-হযরত আলী (রা.) কেবল তাকবীরে তাহরীমায় হাত উঠাতেন; যা নামাযের শুরুতে করা হয়। অতঃপর তিনি আর কোথাও হাত উঠাতেন না।

মুসান্নাফে আবি শায়বায় হাদীসটি এরূপ বর্ণিত হয়েছে-

حدثنا وکیع عن ابی بکر بن عبد الله بن قطاف النهشلی عن عاصم بن کلیب عن ابیه ان علیا کان یرفع یدیه اذا افتتح الصلاة ثم لایعود (مصنف ابن ابی شیبة رقم الحدیث 2442)

অর্থ: হযরত ওয়াকী (রা.) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি আবী বকর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কাতাফ আন নাহশালী থেকে তিনি আসিম ইবন কুলাইব থেকে তিনি তাঁর পিতা কুলাইব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) কেবল নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন, অতঃপর আর দ্বিতীয়বার হাত উঠাতেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) রাফে ইয়াদাইন করতেন না:

মুসান্নাফে ইবন আবি শায়বার ২৪৫২ নং হাদীসে হযরত মুজাহিদ রহ.বর্ণনা করেন, হযরত ইবন উমার তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাতেন না। ইমাম তাহাভী (মৃত.৩২১হি.) বলেন, হযরত ইবন উমর (রা.) রাফে ইয়াদাইন না করাটা এ বিষয়ের উপর বড় দলীল যে, পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফে ইয়াদাইন করলেও পরবর্তীতে তা রহিত হয়েছে। তাই পরবর্তীতে ইবন উমর (রা.) রাফে ইয়াদাইন করেননি। ইমাম তাহাভী হাদীসটি নিম্নের সনদে বর্ণনা করেন,

حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حصین عن مجاهد قال صلیت خلف بن عمر فلم یکن یرفع یدیه الا فی التکبیرة الاولی من الصلاة (شرح معانی الاثار ج1 ص163)

অর্থ-হযরত ইবন আবী দাউদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আহমদ ইবন ইউনুস আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ বকর ইবন আইয়াস আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি হযরত হোসাইন থেকে তিনি মুজাহিদ থেকে। হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন, আমি ইবন উমর (রা.) এর পিছনে নামায আদায় করেছি, তিনি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযে আর কোথাও হাত উঠাননি।

এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইবন আবি দাউদ ছাড়া সবাই ইমাম বুখারীর সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারীর অন্তর্ভুক্ত। ইবন আবি দাউদ সম্পর্কে ইবন হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, তিনি বড় মাপের মুহাদ্দিস ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) রাফে ইয়াদাইন করতেন না

ইমাম বুখারীর উস্তাদ মুহাদ্দিস ইবন আবি শায়বা রহ. বর্ণনা করেন,

حدثنا ابن فضیل عن عطاء عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لاترفع الایدی الا فی سبع مواطن اذا قام الی الصلاة واذا رأی البیت وعلی الصفا والمروة وفی عرفات وفی جمع وعند الجمار (مصنف ابن ابی شیبة، رقم الحدیث2450)

অর্থ- হযরত ইবন ফুদাইল রহ. আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আতা (রহ.) থেকে তিনি সাঈদ ইবন যুবাইর (রহ.) থেকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আববাস (রা.) বলেন, সাত স্থান ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাবে না। এক. যখন নামাযে দাঁড়াবে, দুই. যখন বায়তুল্লাহ দেখবে, তিন. সাফা পাহাড়ে, চার. মারওয়া পাহাড়ে, পাঁচ. আরফায়, ছয়. মুযদালিফায়, সাত. জামরায়।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল- হযরত ইবন আব্বাসের মতে রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠাতে নেই।

আশরা মুবাশশারা রফে ইয়াদাইন করতেন না:

যে দশজন সাহাবী দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, তাদের কেউ নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন সময় রফে ইদাইন করতেন না। এ দশজন সাহাবী হলেন, হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ, হযরত যুবাইর ইবন আওয়াম, হযরত আব্দুর রাহমান ইবন আওফ, হযরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ ইবন যায়িদ এবং হযরত

আবূ উবাইদাহ ইবন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা লেখক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন-

العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كانوا لايرفعون ايديهم الا فى افتتاح الصلاة (عمدة القارى 272/5)

অর্থ-আশরা মুবাশ্শরা যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদের কেউ নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠাতেন না।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. রফে ইয়াদাইন করতেন না

ইমাম মালিক রহ. বর্ণনা করেন, আমাকে নাঈম আল মাজমার রহ. এবং আবূ জাফর তাহাবী (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) তাঁদের নামায পড়াতেন। তিনি নামাযে উঠাবসা করার সময় তাকবীর বলতেন। আর কেবল তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত উঠাতেন।

তাবেঈদের মধ্যে অনেকই রফে ইয়াদাইন করতেন না

হযরত ইব্রাহীম নাখঈ (মৃত.৯৫হি.) রফে ইয়াদাইন করতেন না। তিনি অন্যদের রফে ইয়াদাইন করতে বারণ করতেন। বর্ণিত আছে-

حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين ومغيرة عن ابراهيم انه كان يقول اذا كبرت فى الصلاة فارفع يديك ثم لاترفعهما فيما بقى (مصنف ابن ابى شيبة ج1 ص264)

অর্থ-হযরত হোশাইম (রহ.) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাদেরকে হোসাইন ও মুগীরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা হযরত ইব্রাহীম নাখঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, যখন নামাযে তাকবীর দেয়া হবে তখন হাত উঠাবে। অতঃপর অন্য কোথাও হাত উঠাবে না।

হযরত খায়সামা জুফী তাবেঈ নামাযে রফে ইয়াদাইন করতেন না। ইবন আবি শায়বা রহ. বর্ণনা করেন,

حدثنا ابو بكر عن الحجاج عن طلحة عن خيثمة وابراهيم قال كان لايرفعان ايديهما الا فى بدء الصلاة (مصنف ابن ابى شيبة رقم الحديث 2448)

অর্থ-হযরত আবূ বাকর (রহ.) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি হাজ্জাজ থেকে তিনি তালহা থেকে তিনি খায়ছামা ও ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তারা দু জন নামাযের শুরু ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠাতেন না।

মাশহুর তাবেঈ হযরত কায়স ইবন আবি হাযেম (মৃত-৮৪হি.) নামাযে রফে ইয়াদাইন করতেন না। এ প্রসঙ্গে ইবন আবি শায়বা বর্ণনা করেন,

حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال كان قيس يرفع يديه اول ما يدخل فى الصلاة ثم لايرفعهما (مصنف ابن ابى شيبة رقم الحديث2449)

অর্থ-ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত কায়স রহ. কেবল নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন। অতঃপর আর কোথাও হাত উঠাতেন না।

হযরত আমের আশশাবী আল কূফী (মৃত-১০৯), যিনি প্রায় একশ পঞ্চাশজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইবন আবি শায়বা বর্ণনা করেন,

حدثنا ابن المبارك عن اشعث عن الشعبى انه كان يرفع فى اول التكبير ثم لايرفعهما (مصنف ابن ابى شيبة رقم الحديث 2424)

অর্থ- ইমাম ইবন মুবারক (রহ.) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি আশয়াস থেকে তিনি শাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আশশাবী (রহ.) কেবল তাকবীরে তাহরীমায় হাত উঠাতেন। অতঃপর আর হাত উঠাতেন না।

মাশহুর তাবেঈ আব্দুর রাহমান ইবন আবি লায়লাও কেবল তাকবীরে তাহরীমায় হাত উঠাতেন। রুকুতে যাওয়ার আগে পরে হাত উঠাতেন না। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে বর্ণিত আছে,

معاوية بن هشيم عن سفيان بن مسلم الجهنى قال كان ابن ابى ليلى يرفع يديه اول شئ اذا كبر (مصنف ابن ابى شيبة رقم الحديث-2451)

অর্থ- মুয়াভিয়া ইবন হুশাইম বর্ণনা করেন, তিনি সুফিয়ান ইবন মুসলিম আল জুহনী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবন আবি লায়লা কেবল নামাযের প্রথমে তাকবীরে হাত উঠাতেন।

ইমাম মালিক (রহ.) মাসজিদে নববীতে দরসে হাদীস দিতেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন না হলে তিনি মদীনা শরীফ

ছেড়ে কোথাও যেতেন না। তাঁর সময়কালে তিনি মদীনা শরীফের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। রফে ইয়াদাইনের হাদীস তাঁর কাছে ছিল। তিনি বলেন যে, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কোথাও হাত উঠানামা করার বিধান নেই। আব্দুল্লাহ ইবন রুশদ ইমাম মালিকের মাযহাব বর্ণনা করে বলেন, তাদের মধ্যে সেসব আলিম রয়েছেন যারা রফে ইয়াদাইন কেবল তাকবীরে তাহরীমায় করেন। আর অন্য কোথাও রফে ইয়াদাইন করেন না। কেননা, তাদের কাছে এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) ও বারা ইবন আযেব (রা.)-এর হাদীস রাজেহ (গ্রহণযোগ্য) এবং ইবন উমরের হাদীস মারজুহ্ (অগ্রহণযোগ্য)।

মদীনা শরীফের ইমাম হযরত মালিক (রা.) রফে ইয়াদাইন করতেন না। তাঁর বক্তব্য হল, তিনি মদীনা শরীফে কাউকে নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে রফে ইয়াদাইন করতে দেখেননি। তাঁর এ বক্তব্য কী এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে না যে, রফে ইয়াদাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিয়মিত আমল ছিল না? প্রথমে করলেও পরবর্তীতে তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন।

এছাড়া ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. এর সময়কাল কূফা নগরী ছিল ইলমে হাদীসের মারকায। তাঁর জীবদ্দশায় অনেক সাহাবী কূফায় বসবাস করছিলেন। চার হাজার সাহাবী হযরত উমার ফারুক (রা.) এর আমলে স্থায়ীভাবে কূফায় চলে যান। যাদের মধ্যে তিনশ জন বায়তে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সতের জন বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কূফায় মুয়াল্লেম ছিলেন। আর হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতকালে দারুল খিলাফত ছিল কূফা নগরী। অর্থাৎ হযরত উমার (রা.)-এর খিলাফত কাল থেকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. পর্যন্ত সাহাবী, তাবেঈন ও মুজতাহিদ ফকীহদের কাছে রফে ইয়াদাইন না থাকা কি এ কথার স্পষ্ট দলীল নয় যে, রফে ইয়াদইনের হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে।

কিন্তু যাদের কাছে এ মানসুখের উপর ইল্ম ইয়াকীন হয়নি তারা রফে ইয়াদাইন করছে। অবশ্য এদের সংখ্যা খুবই কম। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের অনুসারীরা রফে ইয়াদাইনের উপর আমল করেছেন। হাদীস শরীফে আছে, 'কোন মুজতাহিদ ঠিক করলে দু সাওয়াব, আর ভুল করলে এক সাওয়াব।' তাই আমরা বলি না যে, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল হাদীস বিরোধী কিংবা হাদীস অস্বীকারকারী। হানাফী মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী এ চারটি মাযহাব সঠিক মাযহাব হিসেবে প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব নাজদী ও তার উত্তরসূরী নাসির উদ্দিন আলবানীর মতে মাযহাবের ইমামদের মানা ও তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানা সুন্নাত বিরোধী, নাউযুবিল্লাহ্। আসলে তারা সহীহ হাদীসের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি ছাড়িয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ নতুন বিদআতী ফেরকা থেকে হিফাযত করুন।

উপসংহার: অসংখ্য সহীহ হাদীস যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইবন মাজাহ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন আবি শায়বা, ইমাম আবদুর রাযযাকসহ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমামগণ বর্ণনা করেছেন, সেসব সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রথমদিকে রফে ইয়াদাইন করলেও পরবর্তীতে তিনি রফে ইয়াদাইন করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেষ আমলই উম্মতের উপর আমল করা অপরিহার্য। ইমাম মালিক (মৃ.১৭৯হি.), যিনি দীর্ঘ দিন মদীনা শরীফে ইলমে হাদীসের খেদমত করেছেন তিনি বলেন, আমি মদীনা শরীফে কাউকে রফে ইয়াদাইন করতে দেখিনি। হযরত ইবন উমার (রা.) থেকে রফে ইয়াদাইন বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হলেও স্বয়ং তিনিও যে নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রফে ইয়াদাইন করতেন না, তা বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিসহ প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব আসুন গোঁড়ামি বাদ দিয়ে আমরা সুন্নাতে সহীহার উপর আমল করি। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের অন্য কোথাও রফে ইয়াদাইন না করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকভাবে রাসূলুল্লাহর অনুসরণের মাধ্যমে সঠিক পন্থায় নামায আদায় করার তাউফীক দান করুন। আমীন!

নবীপ্রেমিক হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.)

• মাওলানা নেজাম উদ্দীন চিশ্‌তী •

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও নৈকট্যার্জন সব মুসলমানের কাম্য। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন,

হার কাছে আজ জনে খোদ শুদ এয়ারে মন, আন্দরূনে মন না জুস্ত আসরারে মান।

অর্থাৎ, আল্লাহর বন্ধুত্বের দাবীদার সবাই, কিন্তু বাস্তব পথের অভিযাত্রী খুবই নগণ্য। পবিত্র কুরআনের ভাষায় এ পথের নাম 'সিরাতে মুস্তাকীম' যার পরিচয় হচ্ছে

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

সার কথা সিরাতে মুস্তাকীম আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাদের পথ, যারা অভিশপ্ত নয় পথভ্রষ্টও নয়। অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দার পরিচয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন পাকে ইরশাদ করেন,

الذين انعم الله عليهم من النبين والصدّيقين والشهداء والصالحين

অর্থাৎ, নবী, সিদ্দীকীন, শহীদান ও সালিহীন তথা সৎকর্মপরায়ন মুমিন আল্লাহর অলীগণ। (সূরা নিসা, আয়াত ৬৯)। আয়াতে পাকে দেখা যাচ্ছে, নবীদের পর আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে সিদ্দীকীনের মর্যাদা সবার উপরে।

সিদ্দীকে আকবরের প্রেম-বাসনা: নবী পাকের সাহাবারা অনাবিল সৌন্দর্য দর্শনে সদা উন্মুখ থাকতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহেরা মোবারক কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হলে তাঁরা প্রিয় নবীর সাময়িক বিরহে প্রেমানলে দগ্ধীভূত হতেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর হৃদয় উজাড় করা ভালবাসার অবস্থা বর্ণনায় হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) ফরমান, 'আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান সারা দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকতেন। ইশার নামাযের পর যখন তিনি ঘরে আসতেন, তখন নবী-বিরহের ক'টি ঘন্টা সময় অস্থিরতায় থাকতেন। বিরহ-বিচ্ছেদের প্রেমানলে দগ্ধীভূত হওয়ার কারণে তাঁর দগ্ধ কলিজা থেকে ঢেকুর উঠত। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পুনরায় দর্শন লাভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার এহেন অবস্থা বিদ্যমান থাকত।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, সৈয়্যদুনা সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) এর ওফাতের কারণও ছিল নবী-বিরহ ও রাসূল হারানোর বেদনা। রসূলের বিরহে তার দেহ মোবারক নেহায়ত দূর্বল হয়ে পড়েছিল।

عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال كان سبب موت ابى بكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال جسمه يجرى حتى مات

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) এর ওফাতের কারণ নবী হারানোর অন্তর বেদনা। একই কারণে বিরহের শোকে মূহ্যমান হয়ে এক পর্যায়ে তার বদন মোবারক দূর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে তিনি ওফাত হয়ে যান (মসনদে আবু বকর ১৯৮ পৃ.)। নবী-বিরহের এহেন অন্তর বেদনায় আল্লামা ইকবাল বর্ণনা করেন:

قوت قلب وجگر کردونی از خدا محبوب تر کردونی
ذره عشق نبی از حق طلب سوز صدیق وعلی از حق طلب

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কিরামের হৃদয়-মনের শক্তি ছিল নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। । তাঁদের নিকট রসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে অধিক মহব্বতের ছিলেন। এ ইশ্‌ক ছিল মূলতঃ সত্যানুসন্ধিৎসু মনের বাস্তব রূপ। বাস্তব প্রেমের সত্যানুসন্ধানের নমুনা ছিলেন সিদ্দীক, আলী তথা সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের নবী-প্রেমের এ বাসনা।

দারুল আরকামের ঘটনা: পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসলামের সর্বপ্রথম বিদ্যাপীঠ ও প্রচার কেন্দ্র সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল দারুল আকরাম। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের ইসলামী শিক্ষা দান করতেন। মুসলমানদের সংখ্যা তখন ৩৯ জন। এমতাবস্থায় সৈয়্যদুনা সিদ্দীকে আকরব (রা.) বাসনা প্রকাশ করেন যে, তিনি কাফিরদের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবেন। এব্যাপারে অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজাযত নিলেন:

قام ابوبكر فى الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وكان أول خطيبا دعا الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم

সৈয়্যদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) উপস্থিত জনগণের সামনে বক্তৃতা পেশ করতে থাকেন। আর সামনে উপবিষ্ট ছিলেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সর্ব প্রথম যিনি প্রকাশ্য ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি দাওয়াত পেশ করেন, তিনিই হলেন সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.)। (তারীখুল খমীস ১ম খণ্ড, ২৯৪ পৃ.)। এ কারণে তাঁকে ইসলামের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়। ফলশ্রুতিতে কাফিররা তাঁর উপর আক্রমন শুরু করে। তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। তাঁকে দেখে কেউ চিনতে পারছিল না। তারা মনে করল যে, তিনি প্রাণে বেঁচে নেই, তখন তারা তাঁকে ফেলে চলে যায়। এমতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনরা চিনতে পেরে তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসেন। পরস্পর পরামর্শ করলেন তিনি যদি মৃত্যু বরণ করে থাকেন তবে অবশ্যই আমরা এর প্রতিশোধ নেব। তার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আবু কুহাফা মাতা উম্মূল খায়ের সালমা ও গোত্রীয় লোকজন এর প্রতীক্ষা করছিলেন। দেখতে দেখতে সম্বিৎ ফিরে আসে। সারা দিন রাসূল প্রেমে বেহুশ ছিলেন। দিবসের শেষ প্রান্তে এসে যখন হুশ ফিরে এল এবং চোখ খুললেন, সর্ব প্রথম যে বুলিটি তাঁর জবানে পাক দিয়ে বের হল,

ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ আল্লাহর নবীর কী অবস্থা। স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। তাদের মনের কথা ছিল, 'আমরা তো এর চিন্তায় বিভোর; আর তিনি কি না অন্যের ভাবনায় মত্ত।' তাঁর আম্মাজান তাঁকে কিছু খাওয়াতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই আশেকে রাসূলের বারংবারই একই কথা, আমি কিছু মুখে তুলব না, যে অবধি না আমার নবীর কোন সংবাদ পাই যে, তিনি কোন অবস্থায় আছেন। প্রাণাধিক পুত্রের নবী-প্রেমের এই অতিশয্য দেখে স্নেহময়ী মাতা বললেন,

والله مالى علم بصاحبك

'আল্লাহর কসম, তোমার বন্ধু কেমন আছেন তা আমি জানি না।' হযরত আবু বরক সিদ্দীক (রাদ্বি.) বললেন, খাত্তাবের কন্যা হযরত উম্মে জমীলের নিকট যান। আর তাঁর কাছ থেকে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আসুন। তাঁর আম্মাজান হযরত উম্মে জমীলের কাছে গেলেন এবং হযরত আবু বকরের বিষয় উপস্থাপন করলেন। যেহেতু এখনো তাঁদের উপর ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখার নির্দেশ ছিল, সে কারণে তিনি জবাবে বললেন, 'আবু বকর ও তার বন্ধু আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের কথা জানি না। হ্যাঁ, তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমার সাথে তোমার ছেলের কাছে যেতে পারি।' হযরত উম্মে জমীল মাতার সাথে হযরত আবু বকর (রাদ্বি.) এর নিকট এলেন, তখন তাঁর অবস্থা দেখে তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। বলতে লাগলেন,

انى لارجو أن ينتقم الله لك

অর্থাৎ, আমার আশা যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর আপনার প্রতিশোধ অবশ্যই নিবেন। তিনি বললেন এসব কথা রাখ, আমাকে বল

ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল কোন অবস্থায় আছেন? তিনি বললেন, 'আপনার মাতা শুনছেন'। হযরত আবু বকর (রাদ্বি.) বললেন 'ভয় করোনা, বল, তিনি বললেন, 'তিনি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন'। একথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) বললেন, মহান আল্লাহর কসম! আমি কিছু খাব না, পান করব না, আমি আল্লাহর রাসূলকে কুশল অবস্থায় না দেখা পর্যন্ত।' নবী-প্রেমে নিমজ্জিত এই প্রেমিককে ধরাধরি করে কোনভাবে দারুল আরকাম নিয়ে আসা হল। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই পাগলপারাকে নিজের দিকে আসতে দেখেন, সাথে সাথে প্রেমিকের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন। উপস্থিত সকলেও তাঁর প্রতি অগ্রসর হলেন। তাঁকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় দেখে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অতিশয় সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) বললেন, আমার মুহতারামা আম্মা এখনে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর জন্য দোয়া করুন। তাঁকে যেন আল্লাহ পাক ঈমানের দৌলত নসীব করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। তিনি ঈমান আনেন।

আমি আপনাকে দেখব: সাহাবায়ে কিরাম নবী পাকের নূরানী চেহেরা মোবারক দেখে দেখে নিজেদের নয়নগুলো তৃপ্ত করতেন। তাঁদের প্রেম-ভালবাসার মাপকাঠি কী ছিল, এ হাদীস থেকে বুঝা যায়। একদা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমাদের এ পৃথিবীতে আমি তিনটি বস্তু পছন্দ করি। এক. সুগন্ধি, দুই. সতী রমনী এবং তিন. নামায (যা আমার নয়নের তৃপ্তময় শীতলতা)।'

সৈয়্যদুনা সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) আরয করলেন, 'আমারও

তিনটি বস্তু পছন্দ,

النظر الى وجه رسول الله وانفاق مالى على رسول الله وان يكون ابنتى تحت رسول الله ﷺ

এক. আল্লাহর রাসূলের নূরানী চেহেরার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, দুই. আল্লাহর দেওয়া সম্পদ সম্পত্তি রাসূলের কদম পাকে উৎসর্গ করা এবং তিন. আমার কন্যা আল্লাহর রাসূলের সহধর্মীনী হওয়া। কোন ব্যক্তি যখন সর্বান্তকরণে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে কোন নেক বাসনা প্রকাশ করে, তখন অবশ্যই মহান আল্লাহর নিজের কুদরতের শান অনুযায়ী সে বাসনা পূর্ণ করেন। এই নিয়মের আওতায় আল্লাহ পাক সৈয়্যদুনা সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) এর তিনটি বাসনার প্রত্যেকটি পূর্ণ করেন। তাঁর সাহেবযাদী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.)কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে কবুল করে নেন। কি সফরে কি অবস্থানে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একান্ত সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন তিনি। এমনকি সওর গুহার একাকীত্বেও রাসূল পাকের সাহচর্য ও দর্শন লাভ হয়। মাযার শরীফেও

أوصلو الحبيب الى الحبيب

'প্রেমাস্পদকে প্রেমাস্পদের সাথে মিলিয়ে দিও।' উক্তি দ্বারা নিজের চির সান্নিধ্য দান করেন তাঁকে। অনুরূপভাবে তাঁর মুক্ত হস্তের স্বতোৎসর্গীকরণও অতিশয় প্রশংসা সহকারে গৃহিত হয়। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দানের বিষয়ে ইরশাদ ফরমান

مانفعى مال أحد قط ما نفعنى مال ابى بكر

অর্থাৎ আবু বকরের সম্পদ দিয়ে আমার যে উপকার সাধিত হয়েছে, আর কারো দান ততটুকু উপকার দিতে পারেনি। (তারিখুল খোলাফা ৩০ পৃষ্ঠা)।

নবী পাকের দর্শন ক্ষুধার্তের তৃপ্তির কারণ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত একদা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সময়ে ঘর থেকে বের হলেন, পূর্বে কখনো এই সময়ে ঘর থেকে বের হতেন না, আর না ছিল এটি তাঁর কারো সাথে সাক্ষাতের সময়।' অকস্মাৎ হযরত সিদ্দীকে আকবরও এসেছেন। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ما جاء بك يا ابابكر হে আবু বকর! এমন অসময়ে আপনি কি ভেবে এখানে? জবাবে তিনি বলেন, 'মনে বাসনা জাগল যে, আমার নবীর সাথে সাক্ষাৎ করব। তাঁর নূরানী চেহেরা মোবারক দেখে হৃদয়-মনের তৃপ্তি মিটাব, তাকে সালাম আরয করব। কিছু সময় যেতে না যেতে হযরত ফারুকে আযমও তথায় উপস্থিত হলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ماجاء بك ياعمر 'ওমর কী প্রয়োজনে আপনি এ সময়ে এখানে? তিনি আরজ করলেন, الجوع يارسول الله 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার কারণে'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, واناقد وجدت بعض ذلك 'আমার এমন কিছু মনে হচ্ছে' (শামাইলুত তিরমিযী ৩১ পৃ.)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এ দু'জন সহচরকে নিয়ে সাহাবী আবুল হাইসাম আনসারী (রাদ্বি.) এর গৃহে উপস্থিত হন। আবুল হাইসাম (রা.) অনেক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। তিনি গৃহে ছিলেন না। তাঁর বিবির কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, আমাদের জন্য পানি আনতে গেছেন তিনি। তবে অল্প সময়ের মধ্যে আবুল হাইসাম (রা.) এসে পড়লেন। তিনি যখন দেখলেন যে, মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সাহাবীদের সাথে করে তাঁর গৃহে মেহমান হয়েছেন, তাঁর আনন্দের সীমা রইলনা। হাদীস শরীফের শব্দমালা দিয়ে তাঁর অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে:

ثم جاء يلتزم النبى ﷺ ويفدية بابيه وأمه

তাঁর কদম মোবারকে লুটিয়ে পড়লেন। বারংবারই বলতে থাকলেন, আমার মাতা-পিতাকে আপনার পাক চরণে উৎসর্গ করলাম।' মুসলিম শরীফে রয়েছে, সে আনসারী সাহাবা যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের ঘরে মেহমান হিসেবে পেলেন, আল্লাহর শুকর আদায় করলেন,

الحمد لله ما اخذ اليوم اكرم اضيافامنى

'সকল প্রশংসা আল্লাহর। আজকে আমার এই সম্মানিত মেহমানের চাইতে মহৎ ও মহান (নিখিল সৃষ্টি জগতে) কেউ কারো মেহমান হতে পারে না। (সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা)। সম্মানিত মেহমানদের নিজের বাগানে নিয়ে যান। তাঁদের বসার জন্য চাদর বিছিয়ে দেন। অনুমতি নিয়ে খেজুরের থোকাগুলো ছিঁড়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানে পেশ করেন। নবী পাক যখন দেখেন যে, সাহাবা থোকার পর থোকা আনছে, বললেন, কেবল পাকা খেজুরগুলো কেন নিচ্ছ না? তিনি বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আপনারা নিজেরা এগুলো থেকে কাঁচা আর পাকা যা আপনাদের খুশী বেছে নেবেন। এই ঘটনাতেও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) এর ঘর থেকে বের হবার উদ্দেশ্য

কেবল এই ছিল যে, তিনি মাহবুবে কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, তাঁর জ্যোতির্ময় চেহেরার দর্শন লাভ করবেন, তাঁকে সালাম আরয করবেন। এই অসময়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে বের হওয়ার কারণ হাদীস বিশ্লেষকরা এই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবুয়তের নূর দিয়ে হযরত আবু বকর (রাদ্বি.) এর সাক্ষাতের এই বাসনা জানতে পেরেছিলেন। ইমাম আব্দুর রউফ আল মুনাদী (রাহ.) শরহে শামায়েল গ্রন্থে লিখেছেন,

وكان المصطفىٰ ادرک بنور النبوّة ان الصديق يريد لقائه فی تلک الساعة وخرج له أبوبكر لما ظهر عليه من نور الولاية ان المصطفى لا يحتجب منه فی تلک الساعة

'এ সময় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাহাবী সিদ্দীকে আকবরকে সাক্ষাৎ-বাসনা পূর্ব থেকেই নবুওয়াতের নূর দিয়ে দেখে নিয়েছিলেন (এ কারণে আদত মোবারকের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তিনি বাইরে এসেছিলেন)। এদিকে বেলায়তের জ্যোতির ভিত্তিতে হযরত সিদ্দীকে আকবরের ইস্পাত-দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময়েও তাঁকে সাক্ষাৎ প্রদানে মাহরূম করবেন না'। (শরহে শামায়েল ২য় খণ্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা) এই বিষয়টিকে সৈয়দ আমীর শাহ গীলানী কাদেরী (রহ.) বর্ণনা করেন,

ظن آن است پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنور نبوت دانست کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ طالب ملاقات اوست پس بر آمد آں وقت بخلاف عادت وابوبکر طاہر گشت بنور ولایت کہ آنحضرت درین وقت بر آمدہ است برائے او تا مطلوبش محصل گردد

'ব্যাপার এই যে, নবুয়তি নূর দিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, এই মুহূর্তে আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) তাঁর মোলাকাতের পরম বাসনা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছেন। তাই তিনিও স্বভাব বহির্ভূত সময়ে বের হয়ে আসেন। এদিকে বেলায়তের নূর দিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) বুঝতে পারলেন যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তারই মনস্কামনা পূরণের জন্য। (আনওয়ারে গাউসিয়া শরহে শামায়েলি নাবিয়্যাহ ৫৩৫ পৃ.) শরহে শামায়িল গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহারানপুরী লিখেছেন, অভ্যাস বহির্ভূত এ সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.)-র ঘর থেকে বের হয়ে আসার কারণ 'অন্তরের সাথে অন্তরের গোপন যোগাযোগের একটি পথ রয়েছে।' হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র দিল মোবারকে হযরত সিদ্দীক আকবর (রাদ্বি.)'র মনোবাঞ্ছার একটি ছবি পড়ে। তিনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৌখিকভাবে আহ্বান করবার পূর্বেই এই অদৃশ্য গোপন ব্যাপারটি সংঘটিত হয়। অমনি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। কতিপয় হাদীস বিশারদ লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রাদ্বি.)'র বেরিয়ে পড়াও ক্ষুধার কারণেই ছিল। কিন্তু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহেরা মোবারক দেখা মাত্রই তাঁর ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত হয়ে যায়। তাই তিনি হুযুরের কারণ জিজ্ঞাসা কালে ক্ষুধার কথা উল্লেখ করেননি।

পবিত্র কুরআনের আলোকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক: হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) এর প্রশংসায় পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে করিমা নাযিল হয়েছে। পাঠকের খেদমতে মাত্র দু'টো আয়াত পেশ করছি। ১. রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون

অর্থাৎ, যে সত্য আনয়ন করেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই মুত্তাকী (পারা ২৪, সূরা যুমার, আয়াত ৩৩)। ইমাম জুযাজ (রহ.) বলেন হযরত মাওলা আলী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত, এখানে جاء بالصدق দ্বারা হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং صدق به দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক উদ্দেশ্য। আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.), আল্লামা ইসমাঈল হক্কী (রহ.) ও ইমাম সুহাইলী (রহ.) প্রমুখ মনীষী এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বুঝা গেল, এ উম্মতের প্রথম মুত্তাকী এবং ইমামুল মুত্তাকীন হচ্ছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.)। তাই শায়ের বলেছেন,

اصدق الصادقين سيد المتقين
چشم وگوش وزارت پر لاکھوں سلام

২.

الا تنصروه نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنين اذهما فی الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا والسفلىٰ وكلمة الله هی العليا والله عزيز حكيم

অর্থাৎ, হে মুসলামনরা, যদি তোমরা আমার হাবীবকে সাহায্য নাও কর তবে স্মরণ কর আল্লাহ তাঁকে এমন নাজুক সময়ে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিস্কার করেছিল আর তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তখন তাঁর সহচরকে বলেছিলেন, চিন্তিত হয়োনা, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক বাহিনী দ্বারা, যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের ধ্যান ধারণা হেয় প্রতিপন্ন করেন, আর আল্লাহর সিদ্ধান্তই সর্বোপরি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী-প্রজ্ঞাময়। (পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ৪০)। মুফাস্‌সিরিন ও সর্বজন স্বীকৃত হক্কানী মুসলিম মনীষীদের সর্বসম্মত মত হচ্ছে এ আয়াত বিবৃত হয়েছে হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এর দ্বারা প্রতিয়মান হয়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) মর্যাদার কথা নির্মল আকাশে পূর্ণিমা শশীর মত।

হাদীসে নববীর আলোকে আবু বকর (রাদ্বি.): প্রিয়নবী ইরশাদ ফরমান,

مانفعنى مال واحد قط ما نفعنى مال ابى بكر

'কারো সম্পদ আমাকে এত উপকার দেয়নি যত উপকার আবু বকর (রাদ্বি.) এর সম্পদ দ্বারা হয়েছে (তিরমিযী শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৫)'।

انت صاحبى فى الغار وصاحبى على الحوض

অর্থাৎ গারে সুরে যেমন তুমি আমার সাথে রয়েছ তেমনি হাউজে কাউসারেও আমার সাথে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ)। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত প্রিয় নবী হযরত আবু বকর সিদ্দীককে সম্বোধন করে বলেন,

انت عتيق الله من النار

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। (মিশকাত শরীফ পৃ. ৫৫৬)। আবু দাউদ শরীফে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাদ্বি.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

اما انك يابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى

অর্থাৎ, হে আবু বকর তুমিই আমার উম্মতের মধ্যে সর্ব প্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মিশকাত শরীফ ৫৫৬ পৃষ্ঠা)।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা প্রিয় নবী আমার কোলে মাথা মোবারক রেখে আরাম করছিলেন, রাতের বেলা আকাশ ছিল নির্মল। অগণিত তারকার দিকে ইশারা করে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির সমান নেক আমল ও সাওয়াব রয়েছে এমন কোন উম্মত আছেন আপনার? ইরশাদ হল হ্যাঁ আছেন, আর তিনি হচ্ছেন হযরত উমর। আমি আরয করলাম আমার আব্বা জান হযরত আবু বকরের নেক আমলের কী অবস্থা? প্রিয় নবী বললেন উমরের সারা জীবনের নেক আমল হযরত আবু বকরের একটি মাত্র নেকীর সমান। (মিশকাত ৫৬০ পৃ.)।

নবীদের পর শ্রেষ্ঠতম মানব হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.): ইসলামের বাস্তব ও সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর মত হচ্ছে, আম্বিয়া কেরামের পর সকল মানবকুলে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.)। এ ব্যাপারে বহু হাদীস পাক রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হল। প্রিয় নবী ইরশাদ ফরমান, নবী ছাড়া এমন কোন মানুষ নেই, যার উপর সূর্যের উদয়াস্ত হচ্ছে আর সে আবু বকর থেকে শ্রেষ্ঠ হবে। নবীজী আরও বলেন,

ابو بكر الصديق خير الناس الا ان يكون نبيا

অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের মধ্যে আবু বকরই শ্রেষ্ঠতম কেবল এই যে তিনি নবী নন। হযরত উমর ফারূকে আযম (রা.) ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.)কে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে স্বীকার করবেনা সে মিথ্যুক ও অপবাদকারীর শাস্তি পাবে। শেরে খোদা হযরত আলী (রাদ্বি.) ফরমান, এ উম্মতের মাঝে প্রিয় নবীজীর পর শ্রেষ্ঠতম মানুষ হচ্ছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.)।

ইনতিকাল: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রা.) এর বর্ণনা মতে, সাতই জামাদিউল আখির গোসলের পর তিনি সর্দিজনিত কারণে জ্বরাক্রান্ত হন। পনের দিন রোগ ভোগের পর বাহ্যিকভাবে এ জ্বর হলেও বাস্তবে গারে সওরে দংশনকারী সাপের বিষক্রিয়ার ফলে তেষট্টি বছর বয়সে দুই বছর দু মাসাধিক কাল খিলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ত্রয়োদশ হিজরী বাইশে জমাদিউল আখির মালিকে হাক্বীক্বীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাহবুবে হাক্বীক্বীর সান্নিধ্যে চলে যান।

দিওয়ানে মঈনুদ্দিনের আলোকে হযরত বাবাভাণ্ডারী কেবলা আলম

• অধ্যাপক জহুরুল আলম •

মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জাতে নূরের অম্লান অংশ হচ্ছে মানব রূহ। মানব দেহে প্রবেশের পর জাতে নূরের সঙ্গে 'রূহ' এর সংযোগ রেখা পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদার কারণে লোভ মোহ দম্ভ দাম্ভিকতার আচ্ছাদন ও অহঙ্কারের মতো 'শিরক' এর মরিচিকায় আবৃত হয়ে নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। তখন জাতে নূরের সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদা 'ক্বালু বালা' লজ্জিত হয় বিধায় নূরের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে আল্লাহর খলিফা মানুষ অন্যায্য অন্যায় অপকর্মে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এক পর্যায়ে জাতে নূরের সঙ্গে মানব রূহের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তীব্রতর হয়। তখন সচেতন এবং পবিত্র রূহ ঐশী বিচ্ছেদ বেদনায় নিজেকে আন্দোলিত করে 'বাঁশরী' হয়ে সুরে ছন্দে বিলাপে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। পবিত্র মানবের এ ধরনের তৎপরতা রূহ এর উচাটন অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জাতে নূরের সঙ্গে ক্ষীণ সংযোগের কারণে পূণ্যবানের কর্মকাণ্ড তখন সর্বাবস্থায় বিরহ বেদনায় ভারাক্রান্ত পরিবেশ অতিক্রম করে। বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ হৃদয়ের অবস্থা তখন ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেউ অনুধাবনে অক্ষম। এ ধরনের পরিস্থিতি অতিক্রম করে নানা ঘাত প্রতিঘাত বাধা বিঘ্ন সমাজ পরিবার পরিজনের স্নেহ মায়া মমতার বাঁধনের প্রতিকূলতায় সৃষ্ট অসম্ভবকে সম্ভব করার মাধ্যমে পবিত্র মানব হৃদয়ে ঐশীতার একটি স্থায়ী আবাসন গড়ে ওঠে। এই আবাসন হচ্ছে মানব হৃদয়ের কাবা। মানব হৃদয়ের এই কাবা গৃহে অসীম অনন্ত অনুপম জ্যোতিষ্মান আলোর প্রবাহ ছড়িয়ে নিত্য নব সাজে নিজেকে উপস্থিত ও উদ্ভাসিত করেন পরম সত্তা 'ইলাহ'। তখন এই পবিত্র রূহ সর্বাত্মক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় পবিত্র মানব ছুরতে মানুষ থাকলেও কর্মকাণ্ডে স্বভাবে প্রকৃতিতে আর মানব থাকেন না। তখন তিনি নূরের প্রজ্বোলতায় উদ্দীপ্ত এবং দৃশ্যমান হন। 'গারে হেরার' ঐশী রুশ্নিতে তন্ময় হয়ে যান সেই মহামানব। এই সময় প্রচণ্ড নীরবতাই হয় স্নিগ্ধ শান্তি এবং চিরন্তন আনন্দের দরিয়া।

দিওয়ানে মঈনুদ্দিন এ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ উল্লেখ করেছেন, 'নিজের সৌন্দর্য থেকে যদি বোরকা উঠিয়ে ফেলি জেনে রেখ, তুমি মত্ত হয়ে পড়বে, হয় আঙ্গুরের শরাবে, না হয় আমার সৌন্দর্যে।' মঈন যদি এ শরাবের শত পেয়ালা পান করে সে পাহাড়ের মতো নিস্তব্ধ হয়ে থাকবে।' ঐশী শরাবের শত পেয়ালা পান করে পাহাড়ের মতো নিস্তব্ধের অনন্য শিরোমনি হলেন গাউসুল আযম হযরত শাহসূফী সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম। উল্লেখ্য যে 'হেরার' প্রজ্বোলতায় উদ্দীপ্ত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) প্রশান্ত ভাব এবং নির্বাক নীরবতা লালনই ছিল তাঁর গাউসিয়তের অনাবিল সৌন্দর্য।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের অনন্য সুন্দর গুলশানের অতুলনীয় খুশবুদার চোখজুড়ানো, চমক লাগানো ইউসুফী সুরতের মনমোহনী গোলাপ হচ্ছেন হযরত শাহসূফী সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম। আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ঐশী প্রেম প্রেরণা জগতে তাঁর রুশ্নি বিশ্ব জগতে ব্যাপক বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে ইতোমধ্যে মানব হৃদয়ে উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর নাম নিতেই আশেক ভক্ত অলিকুলের হৃদয় জুড়ে প্রেম তরঙ্গের উত্তাল ঢেউয়ের মস্তী হালে গগন বিদারী বিলাপ ওঠে, 'ম্যায়হু মস্তে খেয়াল হে ভাণ্ডারী।' গুলশানে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর (ক.) 'গুলে বাগের' খুশবে গুলজার ঐশী প্রেম পিয়াসীরা 'ইশকের দালালীতে' নিমজ্জিত হয়ে সর্বত্র প্রাণকে মহামূল্যবান করে চলেছে, তাঁকে দেখার জন্য। আল্লাহ প্রেমে ফানা হয়ে যাঁরা বিশাল গুলশানে ঘুরে বেড়ান তাঁদের ফরিয়াদ একটাই থাকে, 'প্রাণ থাকতে প্রেমের বাজারে আঁখি খোল।' শুধু তাঁকেই দেখ। অন্য কিছুর তালাশে বিভোর হয়োনা।' হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম তাসাউফ জগতে এ পথের নির্দেশক এবং অভিভাবক। বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম তাসাউফ জগতে 'প্রেম নিধি মাওলা ধন' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন অনন্য এক সাধনা দ্বারা। সুলতানুল হিন্দ আতায়ে রসূল (দ.) খাজা গরীবে নেওয়াজের ভাষায় উল্লেখ করা যায়; (১) 'আমরা মিলনের জন্য হৃদয় এবং প্রাণকে অতিক্রম করেছি; তুমি যদি মিলন না চাও এ পর্যায়কেও আমরা অতিক্রম করেছি। অর্থাৎ ফানার (নিঃস্ব-নিঃসম্বল) অবস্থাতেই ফানাতে বিলীন হয়েছি। ফানার দরিয়ায় তোমার বিষয়কেও অতিক্রম করেছি। ফানার আশ্রমে 'আনাল

হক'কে অতিক্রম করেছি। জীবনে তোমার নাম নিশানার পিছনে দৌড়েছি, তালাশ করতে গিয়ে আমরা নাম নিশানাকেও অতিক্রম করেছি। নিশ্বাস ফেলার স্থলে হৃদয় কী করবে, রূহ ও মনের মর্তবাকেও অতিক্রম করেছি। এক পেয়ালা আমাদের দিয়েছে, যা দিয়ে প্রাণকে অতিক্রম করেছি। যা কিছু তালাশ করতাম তার কাছে হঠাৎ পৌঁছে গেছি, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে পড়েছি এবং সে অবস্থাও অতিক্রম করেছি। স্বচক্ষে মনসুরের চেহারা আমরা দেখেছি, তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যার গন্ডিকেও অতিক্রম করেছি। এমন জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে আশেক ও মাশুকের মধ্যে কোন ফারাক নেই। সর্বোপরি আমরা সেটাও নই, তাকেও অতিক্রম করেছি। যেহেতু খোদার পবিত্র দরবার আমার মনজিলে মকসুদ। সেহেতু দু'জগতের ঘটনাবলীকেও অতিক্রম করেছি। মঈন আজ স্বচক্ষে দেখেছে তোমার রূপ। তাই আগামীকালের বেহেস্তের ওয়াদাও অতিক্রম করেছি। মঈন এশকের নগরী থেকে আসছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, যদি সে খ্যাতি লাভ করে। দিওয়ানে খাজার প্রতিটি শব্দ বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের সাধনা রীতি এবং লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে অবিকল একাকার হয়ে গেছে।

ঐশী প্রেম পেয়ালা হাতে সাকী সেজে মাশুক যখন বার বার আশেককে পতঙ্গের মতো অনল প্রবাহে ঝাঁপ দিতে আহ্বান জানায় তখন নিঃস্ব নিঃসম্বল পাগলপারা আশেক খাজা মঈনের ভাষায় বলে ওঠেন, 'সাকি সময় হয়েছে, শরাবের পেয়ালা মস্তানকে দাও, যদিও আমি নিজ মস্ততার যন্ত্রণায় ঢুলু ঢুলু।' আল্লাহর সঙ্গে মিলনের যোগ্যতা অর্জনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে আমিত্বকে ছিন্ন করা। অহংবোধকে ভস্ম করে ফেলা। খাজা চিশতির ভাষায়; প্রেমাস্পদের নিকট তিনি জানতে চেয়েছেন, 'কে রাখে তাঁর সাথে মিলনের যোগ্যতা।' প্রেমাস্পদ বলেছেন, 'আমিত্বকে যে ছিন্ন করেছে, সে এসেছে আমার মিলন মেলায়।' প্রেম বিষয়ে মহান আল্লাহর নূরানী ঝলকের বর্ণনা দিতে গিয়ে গরীবে নেওয়াজ বলেছেন, 'যে মিসকিন আশেক আপন অবস্থায় কিভাবে ঠিক থাকতে পারে।' আশেকের এ ধরনের অবস্থা সম্পর্কে বাবাভাণ্ডারী কেবলা আলমের জীবন চরিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। সাধনার এ পর্যায়ে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম নিজেকে তুর পাহাড়ের মতো ভস্ম করতে সক্ষম হয়েছেন। বাবা ভাণ্ডারী কেবলার এ অবস্থানকে গরীবে নেওয়াজের দিওয়ানের ভাষায় বলা যায়, 'তোমার সৌন্দর্যের বাতিতে আমি পতঙ্গ সেজেছি, একটা স্ফুলিঙ্গ উপস্থিত হয়েছে এবং আমাকে আমার থেকে নিয়ে গেছে।' পাহাড়ে জঙ্গলে বিষাক্ত কাঁটা বিঁধে, সমুদ্রে শ্বাপদ সংকুলে এবং বিরান ভূমিতে নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থায় ভ্রমণে ভ্রমণে কালাতিপাত করার মাধ্যমে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম যখন ফানা অতিক্রম করে বাকার শত নূর আলিঙ্গন করেছেন' এ সময় তাঁর দেহ মন প্রাণ হৃদয় সবই একাকার হয়ে ঐশী চাদরে আবৃত্ত হয়ে যায়। তখন আশেক মস্তানদের উচ্চারণ হয় খাজা গরীবে নেওয়াজের ভাষায়, 'রাস্তায় দেখেছি হৃদয় হারিনী, ভয়ঙ্কর আশেক হন্তা, মাথায় টেনেছে চাদর যেন আত্ম গোপন করে চলে যেতে পারে।' বক্বার অবস্থানে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা ছিলেন নিঃসন্দেহে হৃদয় হারিনী, ভয়ঙ্কর আশেক হন্তা, চাদরে ঢেকে রেখে আত্মগোপন করতে চেয়েছিলেন। নিজেকে গোপন করে রাখার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর পাহাড়ে জনমানব বিহীন গহীন অঞ্চলে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আশেক মস্তানদের আহাজারি এবং ফরিয়াদ, একই সঙ্গে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বাবাভাণ্ডারী কেবলার আত্মগোপনে বিলয় সাধনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। হযরত কেবলা আলমের বেচালের পর বরং তিনি 'মওলা রহমান, নূরে রহমান' অভিধায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফকে ঐশী প্রেম উন্মত্ততায় উদ্দীপ্ত করে তুলে ভয়ঙ্কর আশেক হন্তা হিসেবে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন।

সূফি উদ্ধৃতি

■ আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে তিনটি স্বভাব দান করেন। যথা– (ক) সমুদ্রের মত বদান্যতা, (খ) সূর্যের ন্যায় উদারতা ও (গ) ভূতলের ন্যায় নম্রতা।"

■ আল্লাহ যাকে যোগ্য ও উপযুক্ত করেন, তার পিছনে এক ফিরআউন লাগিয়ে দেন।"

■ সৎ সাহচর্য সৎকার্য থেকে উত্তম আর কুসংসর্গ কুকার্য থেকে মন্দ।"

–হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ)

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (রহ.) এর সূফী দর্শন

• অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান •

ভারতীয় উপমহাদেশে সূফীদর্শন তথা তাসাউফ চর্চা সুনিপুণভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সফলতার সাথে যাঁরা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত খাজা মঈনউদ্দীন হাসান সন্‌জরী (রাহ.)। এ উপমহাদেশের মানুষ খুবই ভাগ্যবান এ অর্থে যে, এ অঞ্চলে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.) এর মত ক্ষণজন্মা একজন মহান অলিআল্লাহর আগমন ঘটেছে। ভারতে রাজস্থানের অন্তর্গত আজমীর নামক স্থানে এ মহান বুজুর্গ আস্তানা প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। তিনি কুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা, কিয়াস এবং এসব জ্ঞানের নির্যাস সূফীতত্ত্বের বিকাশসাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী, ভক্ত, মুরীদান ও খলিফাগণের মাধ্যমে রাজস্থান তথা পুরো ভারতবর্ষে ধার্মিকতা, সামাজিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে পরিচালনা করেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.) এর মত মহান একজন দরবেশের জীবনের প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ শৈশব, কৈশোর এবং ভারত আগমনের পর তাঁর ধর্মীয় মিশন-ভিশন ও দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পর্কে খুবই স্বল্প তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য, জনশ্রুতি এবং তাঁর জীবনের শেষাংশের আধ্যাত্মিক তথা সূফীতাত্ত্বিক জীবনের রহস্য উন্মোচিত হওয়ার বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন গবেষকরা। হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (রাহ.) সন্‌জর নামক এলাকায় এক ধার্মিক সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম 'হাসান' তিনি খোরাসানে লালিত পালিত হন। তাঁর একমাত্র সম্বল ছিল একটি বাগান এবং একটি পন-চাক্কি (wind mill)

হযরত ইব্রাহীম ক্বান্দুজী নামক এক সূফী সাধকের সান্নিধ্যে এসে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়, দুনিয়ার প্রতি তাঁর মায়া-মোহ আসক্তি ইত্যাদি হ্রাস পেতে থাকে। তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে সকল সহায়-সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দেন এবং তাসাউফ শিক্ষা তথা সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহ পাকের মহান ইচ্ছায় তিনি ধীরে ধীরে একজন সফল সূফী দরবেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকেন। দীর্ঘ আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি ধর্মীয় বিজ্ঞান চর্চায় ব্রতী হন। বুখারা ও সমরখন্দের অনেক পীর বুজুর্গের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং শেষতক বাগদাদে পৌঁছে হযরত উসমান হারুনী (রাহ.) এর নিকট নিজেকে সমর্পন করে তাঁর পবিত্র হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।

হযরত উসমান হারুনী (রাহ.) এর নিকট প্রায় কয়েক দশক সূফী দর্শন অনুশীলনের (তরবীয়ত) পর তিনি স্বীয় মুর্শিদের সাথে বিভিন্ন এলাকায় সফর করতে থাকেন। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে মক্কাশরীফ ও মদীনা শরীফসহ এতদঞ্চলের ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান সমূহ পরিদর্শন করে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অসংখ্য প্রসিদ্ধ সূফী সাধকের সাক্ষাৎ পান এবং বহু সূফী দরবেশের মাজার জিয়ারত করে ধন্য হন।

১১৯০ খ্রিঃ এর দিকে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। রাজস্থানে আজমীরে এসে প্রথমে তিনি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আধ্যাত্মিক মিশন শুরু করেন এবং এ মিশন তাঁর বেছাল (১২৩৫) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তৎকালীন ভারতবর্ষে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র বৈষম্যের এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছিল। গোত্রে-গোত্রে হিংসা, বিদ্বেষ ও নানা অপরাধকর্ম লেগেই থাকত। এ সংকটময় মুহূর্তে মানবজাতির কল্যাণ তথা মানবতাবোধ জাগ্রত করার জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে "Love for all, malice to none," (সবার প্রতি ভালোবাসা কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়) নীতিতে মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান জানালেন হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (রাহ.)। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবিকতা, সাম্য, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবপ্রেম সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে চির কল্যাণের দিকে নিয়ে আসা। তিনি হাজার হাজার নিগৃহীত, নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত মানুষ ও বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একজন যুগ সংস্কারক হিসেবে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বস্তুতপক্ষে ভারত বর্ষে তথা হিন্দুস্থানের জমিনে খাজা গরীবে নেওয়াজের সূফী দর্শন প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থায় একটি স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। খাজা গরীবে নেওয়াজ তাঁর সুযোগ্য খলিফা এবং উত্তরসূরীদের ভারতের বিভিন্ন অংশে

পাঠিয়ে শান্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্লেষকদের মতে খাজা গরীবে নেওয়াজ ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি মানুষকে চিশ্‌তী আদর্শ অনুযায়ী (চিশ্‌তীয়া ত্বরীকা), মহানুভবতা, মানবতাবাদ ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

খাজা গরীবে নেওয়াজের খলিফাদের মধ্যে সূফী হামিদউদ্দীন নাগোরী (যিনি জৈন ও বিষ্ণুদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন)। শেখ মুহাম্মদ তুর্কী (রাহ.) এবং তাঁর নিজ সন্তান ফখরুদ্দীনকে (রাহ.) সরওয়ার (মন্ডল) নামক স্থানে এবং নাতি খাজা হুশামউদ্দীনকে সাম্বার হ্রদে পাঠান। তাঁর আরেক সন্তান খাজা আবু সাঈদ (রাহ.) এবং কন্যা বিবি হাফিজা জামাল (রা.) খাজা সাহেব (রাহ.) এর সাথে আজমীরে অবস্থান করেন। তাঁরা প্রায় সময় দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে সফর করতেন বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। ভারতবাসীর নিকট ইসলামের সুনিপুণ বৈশিষ্ট্য তিনি এত সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের অমুসলিম জনগণের মধ্যে একটি আত্মিক জাগরণ সৃষ্টি হয়। ইসলাম তথা মুসলমানদের সম্পর্কে ভারতীয়দের যে একটি ভুল ধারণা ছিল তা ধীরে ধীরে দূরীভূত হতে থাকে এবং মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য ও সহানুভূতিশীল মনোভাব জাগ্রত হতে শুরু করে। তাঁর ধর্মীয় আচার-আচরণ, ন্যায়নীতি, সূফীদর্শন তথা মানবতাবাদ মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকে। মানুষ দলে দলে তাঁর পদযুগলে আত্মসমর্পণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিক্বমত সহকারে কুরআন হাদীসের আলোকে তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে মানুষকে শান্তির ঠিকানা প্রদর্শন করেন তিনি। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ এবং তাসাউফ চর্চা মানুষকে আকৃষ্ট করে চরমভাবে। কারণ তাঁর ধর্মীয় মূল্যবোধ ছিল সম্পূর্ণ মানবতাদ, নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবপ্রেম সমৃদ্ধ। ফলে তদানিন্তন ভারতের দিশেহারা হাজার হাজার মানুষ পতঙ্গের মত ছুটে এসে তাঁর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি স্থানীয় জনগণের সাথে সমকালীন কৃষ্টি, সভ্যতা, সামাজিকতা ও ধর্মীয় বিষয়ে কোন ধরণের বিতর্কে না জড়িয়ে বরং সব কিছুর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেন। তিনি এত সহানুভূতিশীল ও মহানুভব ছিলেন যে তাঁর এক মুরীদ ইসলাম কবুল করার পরও তাঁকে স্বনামে (মধু) রেখে দেন। পরবর্তীতে ঐ মুরীদকে আজমীর শরীফে জুমা মসজিদের ইমামতের দায়িত্ব দেন। তাঁকে সকলে শেখ ফকীহ্ হিসেবে চিনত। ঐ ব্যক্তিকে 'ফিকাহ্' শাস্ত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ইমামতের দায়িত্ব দিতে দ্বিধা করেননি খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.)।

তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের দেয়া উপাধি গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। তিনি অহেতুক প্রাণী হত্যা কিংবা গরু ও অন্যান্য পশু হত্যা কিংবা এগুলো পুড়ে ফেলা পছন্দ করতেন না, বরং এটাকে তিনি একটি গর্হিত ও পাপ কাজ মনে করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ খলিফা সূফী হামিদউদ্দীন নাগোরী ছিলেন নিরামিষভোজী (Vegetarian), যেহেতু তিনি গোশত পছন্দ করতেন না তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর ফাতিহা শরীফ উপলক্ষে মিষ্টি বা নিরামিষের আয়োজন করা হত। অধিকন্তু স্মরণাতীত কাল হতে খাজা গরীবে নেওয়াজের দরগাহ শরীফে চিনি, যব ও লবণ দিয়ে প্রস্তুতকৃত খাবার দৈনিক দু'বার সকাল ও বিকালে ভক্তদের মাঝে পরিবেশন করা হত। কখনো গোশ্‌ত পরিবেশন করা হত না। অবশ্য বর্তমানে 'বড় ডেক' ও 'ছোট ডেক'-এ মিষ্টি ভাত (খিচুড়ী ভাত) প্রস্তুত করে পরিবেশন করা হয়। খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.) সম্প্রীতিপূর্ণ মনোভাব ও হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান নীতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্তে এবং অন্যান্য-ধর্মাবলম্বীদের যেন মনোকষ্টের কারণ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ ও মমতা এবং তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি ছিলেন প্রবল সহানুভূতিশীল। এমনিতেই সৃষ্টির একেবারে ক্ষুদ্র জীবের প্রতিও সূফী সাধকদের অগাধ প্রেম-ভালবাসা পরিলক্ষিত হয়। একদা সূফী হামিদউদ্দীন নাগোরী কয়েকটি পিঁপড়া তাদের আপন গন্তব্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিবেচনায় তিনি ঐ পিঁপড়াগুলোকে নিজ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সূফী সাধকগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদতের পাশাপাশি স্রষ্টার সকল সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও ছোট-বড় নির্বিশেষে পরম মমতা প্রদর্শন করে থাকেন। খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.)ও তার ব্যতিক্রম নন। হিন্দুস্থানের জমিনে অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি তিনি সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন নিখাদভাবে।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.) ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। হযরত ইবনুল আরবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নীতির ধারাবাহিকতা সূফী সাধকদের মাঝে

বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.)এর মতে এ নশ্বর পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তুই অস্তিত্ববিহীন (গাইরে মজুদ) কিন্তু একমাত্র অস্তিত্ব সম্পন্ন হল আল্লাহর নূর (নূর-এ-খোদা) যা কখনো বিলীন হবেনা। অর্থাৎ আমরা ছিলাম না, আছি থাকবনা, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব ছিল, আছে এবং থাকবে। মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়া, সামাজিক উন্নতি এবং সর্বোপরি জনকল্যাণকর কর্মকাণ্ডের প্রতি খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.) সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি ইসলামের মূল বিষয়গুলো যেমন- ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত এর প্রতি খুবই সজাগ ছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিনি মানুষকে সমুদ্রের মত উদার, সূর্যের মত দয়ালু এবং মাটির মত ধৈর্যশীল হওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ দিতেন। খুব সম্ভবতঃ ভারতের লোকজন যেহেতু সূর্যকে 'সূর্য দেবতা', নদী 'গঙ্গাকে' 'গঙ্গা মাতা' এবং নিজ মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসা প্রদর্শন করত এবং এগুলোকে পূঁজা করত সেহেতু খাজা গরীবে নেওয়াজ এ তিন জিনিসের যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ তার প্রশংসা করতেন যাতে করে ধর্মীয় বিষয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি না হয়। তিনি মনে করতেন উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে মানব মনকে জয় করতে পারলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাবে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে ও আর্থিক উন্নতি হবে। সমাজের ধনবান ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল যে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের (ই'তাদ) এবং জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচার অন্যতম উপায় হলো অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব পূরণ করা, মজলুমকে সাহায্য করা, গরীবদের মনের ইচ্ছা পূরণ করা এবং ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া। এ আহ্বানের মাধ্যমে খাজা বাবা সমাজে উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, ভেজাল-নির্ভেজাল, বিজিত-পরাজিত নিয়ে যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত করতে সক্ষম হন। খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.) বলেন, আল্লাহ যাদের ভালবাসেন তাঁদের উপর দুঃখ-দূর্দশার বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সূফীতত্ত্বের দর্শনালোকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা পেতেন যে, আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করা কঠিন কোন কাজ নয়। খাজা গরীবে নেওয়াজ (রাহ.) আরো বলেন, 'পাপ মানুষকে তত বেশি ক্ষতি করে না যতটুকু একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করলে ক্ষতি হয়।' এটা অনস্বীকার্য যে, বর্ণ বৈষম্যবাদ কখনো সমাজে শান্তি বয়ে আনতে পারে না।

একজন সত্যানুসন্ধিৎসু (দরবেশ) একদা খাজা গরীবে নেওয়াজকে (রাহ.) তৃরিকৃত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে তিনি নয়টি বিষয় উল্লেখ করেন। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল–

পার্থিব লোভ-লালসা ত্যাগকারী (তরিক-এ-দুনিয়া) ব্যক্তি যিনি হালাল-হারাম পরখ করে চলেন। তিনি বলেন, সূফী দর্শন (তৃরীকৃত) হলঃ

১. পার্থিব সুখ-শান্তির পেছনে ছুটাছুটি না করা।
২. ঋণ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা।
৩. সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা, সকল দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য করা এবং কারো নিকট নিজের অভাবের কথা প্রকাশ না করা।
৪. দুই দিনের বেশি অন্ন-বস্ত্র মজুদ না রাখা, যদি এর বেশি থাকে তাহলে তা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া।
৫. কোন মানুষকে অভিশাপ না দিয়ে বরং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।
৬. সূফী দরবেশগণ যা কিছু পায় পীরের খিদমত হতেই পায় এবং তা আল্লাহ এবং নবীজির সন্তুষ্টির ফসল।
৭. আর যদি কারো জীবনে খারাপ কোন কিছু ঘটে তাহলে বুঝতে হবে এটি ঐ ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল।
৮. ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত সূফী যিনি দিনের বেলায় রোজা রাখেন আর রাত্রি বেলা ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকেন।
৯. যতটুকু সম্ভব চুপ থাকা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা না বলা। শরীয়তে একেবারে চুপ থাকা যেমন অন্যায় আবার বেশি কথা বলাও নিষিদ্ধ। সুতরাং প্রয়োজন ব্যতিত কথা না বলাই উত্তম।

খাজা গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনউদ্দীন চিশতী (রাহ.) এর উপর্যুক্ত সূফী দর্শন আমল করার জন্য আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন, আমিন।

তথ্যসূত্র:

1. Muslim Shrines in India – by. W. Troll. Oxford University Press
2. Sufi Movement in Rajstan – by. Prof. Aziz Uddin Hossain
3. The Teachings of Khwaja Moinuddin Chisti in the social context. by. Dr. S. Liyaqat H. moini.
4. The Chisti Sufis in the Indian Sub Continent. by. Dr. S. Liyaqat H. Moini.
5. The Life and Teachings of Khwaja Garib-e-Newaj Hazrat Moinuddin Chisti (R.). by. Abdul Hameed.

বাঙালির নববর্ষ

• আলোকধারা ডেস্ক •

বাঙালি জীবনে বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতি গবেষণার দুটি পদ্ধতি যথা, ডায়াক্রনিক ও সিনক্রনিক উভয় দিক থেকেই দেখা যেতে পারে। সিনক্রনিক এ্যাপ্রোচ একালে আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত এবং বহুলভাবে অনুসৃত। এর জটিল কাঠামোগত বিন্যাস প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে না গিয়েও এর মৌল প্রবণতা অনুযায়ী সমকালীন প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে আলোচনার পদ্ধতিই আমরা গ্রহণ করছি।

বাংলা ভাষাভাষী আমাদের এই পূর্ব বাংলা অঞ্চলে নগরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের মধ্যে বাংলা নববর্ষের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার শুরু ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন স্বাদেশিক চেতনা, ঐতিহ্য ও শিকড়, অনুসন্ধান প্রবণতা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, পরবর্তীকালের প্রবল ও সক্রিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে তা মৌলিক উপাদান হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। বাঙালি মুসলমান যে বাংলা নববর্ষ ও বাংলা সন সম্পর্কে একেবারে জানতেন না এমন নয়, অনেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালিত্বের এই উপাদানকে গ্রহণ করার জন্যে উদ্যোগও নিয়েছিলেন, যেমন মোবারক আলী খান, তাঁর 'বাংলা সনের জন্ম কথা' শীর্ষক পাকিস্তান পূর্বকালে বশির হাটে লেখা বইটির (১৩৪৫) মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো পাকিস্তান পূর্বকালে কলকাতায় স্বল্প শিক্ষিত বা মোটামুটি ভাল শিক্ষাগত পটভূমিকার বাঙালি মুসলমানেরও নিজস্ব সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট ছিল না। তারা হিন্দু বাঙালিকে 'বাঙালি' ভাবতেন, কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তার ধরণটি ছিলো নানা জটিলতায় আচ্ছন্ন। বাংলা সন ও পঞ্জিকা তারা মানতেন, নিত্যদিন ব্যবহার করতেন এবং অবধারিতভাবে পূর্ব বাংলার গ্রামের বাড়ীতে বাংলা পঞ্জিকাই নিয়ে আসতেন কলকাতা থেকে। এখনকার মতো সুদৃশ্য ইংরেজি পঞ্জিকা নয়, দৈনন্দিন ব্যবহার্য বাংলা পঞ্জিকাই শোভা পেত চাকুরি ও ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে কলকাতায়, কর্মরত পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের ঘরে।

মোবারক আলী খান বাঙালি মুসলমানদের এই অতি ব্যবহার্য বিষয়টিকে একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন তাঁর পূর্বোক্ত ওই ছোট বইটির মাধ্যমে। বাংলা সন বাঙালির এবং অবশ্যই বাঙালি মুসলমানেরও একথা দৈশিক ঐতিহ্য ও সামাজিক পটে স্থাপন করে বলা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। ফলে গ্রহণযোগ্য হন কিনা এ সম্পর্কে দ্বিধা ছিল তাঁর। তাই বাংলা সনের ইতিহাস টেনে তিনি এসব যে মোগল সম্রাট আকবর প্রবর্তন করেছিলেন এবং এর সঙ্গে হিজরী সনও এর চান্দ্র বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে সে বিষয়টিকেই জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় এর প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির এও একটা কৌশল। মৌলিক রূপান্তর এ বৃহৎ সংস্কারহীন এই দেশে ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবন ও উপাসনাগার থেকে রাষ্ট্রীয় ও আবিলতাপূর্ণ জনজীবনে সামান্য কারণে এবং যখন তখন টেনে আনায় মহান ও পবিত্র ধর্মেরই ক্ষতি করা হয়। অথচ অগ্রগামী সাংস্কৃতিক চেতনা ও প্রাজ্ঞ ইতিহাস ও ধর্মবোধ না থাকলেও এ বিষয়টি উপলব্ধি কর সম্ভব হয় না। সংস্কৃতির বিকাশে ধর্মীয় উপাদান যেটুকু আসে তা একেবারে ভেতরের দিক থেকে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মীকৃত হয়ে আসে। আরোপিত হয়ে এলে তা নানা বিপর্যয় ঘটায়, ইউরোপে খৃস্ট ধর্ম তা ঘটিয়েছে। অতএব, মোবারক আলী খানের সমকালে প্রাজ্ঞময় চেতনা হয়ে আছে মনীষী লেখক ব্যারিষ্টার এস ওয়াজেদ আলীর রচনায়। তিনি আপোষমূলক ও কৌশলময় ধারার মধ্যে না যেয়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আলোকে সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখছেন, "ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক না করলে ধর্ম আর ধর্মই থাকে না, বড় একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয় ... অনুষ্ঠানমূলক সামাজিক ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভূষিত করার অর্থই হচ্ছে প্রগতির সর্বাধিক পথকে অর্গলবদ্ধ করা" (ভবিষ্যতের বাঙালি) ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বপ্ন ও সংগ্রামে, পূর্ব বাংলার সচেতন বুদ্ধিজীবী ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশেষ করে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এস ওয়াজেদ আলীর

অগ্রগামী আদর্শেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯৫০-এর দশক থেকে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার সূচনা হয় তার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি বিশেষ করে নবগঠিত মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে বাংলা নববর্ষের উৎসব উদযাপন শুরু করেন। সূচনাপর্বে এই নতুন উদ্যোগ পাকিস্তান সরকার ও তার এদেশীয় সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দোসরদের প্রবল আক্রমনের মুখে পড়ে। বাঙালি সংস্কৃতির এই নতুন বিন্যাস ও বিকাশ প্রক্রিয়াকে 'হিন্দুয়ানি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলা নববর্ষের সঙ্গে নানা আঞ্চলিক আচার-অনুষ্ঠান ও এদেশের আদিম জনগোষ্ঠীর উৎসব, ব্রত, কামনা প্রভৃতি যুক্ত থাকায় এবং তিথি নক্ষত্র, শুভাশুভের সম্পর্কের জন্যে একে হিন্দুদের সন বলে প্রচার করা হয় এবং এও বলা হয় যে, বাংলা সাল পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আদর্শের পরিপন্থী। মজার ব্যাপার হলো এই যে, মধ্যযুগে এই সব আঞ্চলিক আচার-অনুষ্ঠান পালা-পার্বন ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে মুসলমান সুলতানরা বাধাগ্রস্ততো করেনইনি বরং নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং এভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালির সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী ভিত্তি নির্মিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে এই ধারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে, একে কেটে ছিঁড়ে এর 'অবাঞ্ছিত' অংশ বাদ দেয়া প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলেই অসম্ভব।

বাংলা নববর্ষ আমাদের ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটিয়েছে। গ্রামীণ মেলার হুবহু অনুকৃতি শহরে সম্ভব না। তাই গরুর দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই না থাকলেও বেশ বড় বড় মেলা বসছে শহরের বিভিন্ন এলাকায়। রবীন্দ্র-নজরুলের গানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামীণ বয়াতিদের গান, বিন্নি, কদমা, খেলনা, মৃৎপাত্রাদির বিকিকিনি।

বাংলা নববর্ষ ও বৈশাখী প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ ইনামুল হক বলেন, 'আমাদের অধুনাতন নববর্ষ এদেশের গ্রীষ্মকালীন আর্তব উৎসব কৃষ্যুৎসব উদযাপনের একটা বিবর্তিত নব সংস্করণ। এর ঐতিহ্য প্রাচীন। কিন্তু রূপ নতুন। নতুন সংস্কার, নতুন সংস্কৃতি, নতুন চিন্তাধারা অবারিত স্রোতে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে এমন এক নতুন আবহ, যাকে একটা দার্শনিক পরিমণ্ডল বলে উল্লেখ করতে হয়। পরিমণ্ডলে পুরাতন বিলীন, জীর্ণস্তূপ, নিশ্চিহ্ন, মিথ্যা বিলুপ্ত ও অসত্য অদৃশ্য। আর নতুন আবির্ভূত নবজীবন জাগরিত সুন্দর সম্মিত ও মঙ্গল সম্ভাবিত। কাল-বৈশাখীই এর প্রতীক। সে নববর্ষে অমোঘ সহচর, নবসৃষ্টির অগ্রদূত সুন্দরের অগ্রপথিক ও নতুনের বিজয় কেতন।'

সূফী উদ্ধৃতি

■ যারা দুনিয়াকে শুধু একটি আমানতের মালের মত মনে করেন, তারা প্রয়োজন কালে অনায়াসে তা আমানতের মালিকের হাতে সোপর্দ করে চলে যেতে পারেন। তাদের মনে কোনরূপ দুঃখ অশান্তির সৃষ্টি হয় না।

■ যে পার্থিব গৃহকে ভেঙে-চুড়ে ভগ্নস্তূপের উপর পারলৌকিক সৌধ রচনা করে, আর পার্থিব মোহাবিষ্ট হয়ে পারলৌকিক সৌধ ভেঙে তার উপর পার্থিব প্রাসাদ রচনায় নিয়োজিত হয় না, মূলত সে লোকই হল প্রকৃত বুদ্ধিমান।

–হযরত হাসান বসরী (রাহ্)

■ যার আয়ু শুধু রূহ ও আত্মার উপর নির্ভরশীল, রূহ বা আত্মার বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তার আয়ু শেষ হয়– সে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু যার আয়ু বা জীবন আল্লাহ তা'লার উপর নির্ভরশীল, তার কখনও মৃত্যু ঘটে না বরং সে অপ্রকৃত জিন্দেগী থেকে প্রকৃত জিন্দেগী অর্জন করে মাত্র।

–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ্)

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে

• জাবেদ বিন আলম •

পূর্ব প্রকাশের পর:

আল্লাহর অসীম দয়ার বরকতে হযরত মুসা (আ.) লালিত হন ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার পরম পরশে রাজ প্রাসাদে। মহান আল্লাহ নানা ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে অলৌকিকতার বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ রেখেছেন হযরত মুসা (আ.) এর জন্ম বৃত্তান্তে। রাজ প্রাসাদে অতি যত্নে লালিত হযরত মুসা (আ.) লক্ষ্য করলেন ফেরাউনের সমর্থক কিবতীদের অত্যাচারে স্বীয় সম্প্রদায় (হযরত মুসা (আ.) এর সম্প্রদায়) ইসরাইলীরা মানবেতর জীবন যাপনের মাধ্যমে 'দলিত' জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে অবহেলা, দৈহিক নির্যাতন, শারিরীক অত্যাচারকে নিত্য ভোগ্য প্রাপ্তি হিসেবে ধারন করে কোন প্রকারে জীবন অতিবাহিত করছে ইসরাইলীরা। এ ধরনের জুলুমের মুখে পতিত এক ইসরাইলীকে উদ্ধার করতে গিয়ে হযরত মুসা (আ.) এর চপোটাঘাতে মৃত্যু বরণ করে এক কিবতী। এ ঘটনার মাধ্যমে হযরত মুসা (আ.) এর ফেরাউনী জাহেলিয়াত বিরোধী প্রতিবাদী কর্মকান্ডের সূত্রপাত ঘটে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তীতে আরো ঘটনা সংঘটিত হবার লক্ষণ দেখা দেয়ায় হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মাদইয়ানের উদ্দেশে মিশর ত্যাগ করেন এবং হযরত শোয়াইব (আ.) এর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং হযরত শোয়াইব (আ.) এর অভিপ্রায়ে হযরত মুসা (আ.) হযরত শোয়াইব (আ.)এর কন্যা সফুরাকে বিয়ে করেন। দীর্ঘ দশ বছর হযরত শোয়াইব (আ.) এর নৈকট্যে অতিবাহিত করার পর হযরত মুসা (আ.) প্রচুর ধন সম্পদ এবং লোক লস্করসহ মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অসুস্থ স্ত্রীর কারণে যাত্রা বিরতিকালে রাতের আঁধার দূরীভূত করার লক্ষ্যে বাতির সন্ধানে বের হন। তাঁবু থেকে অনতিদূরে তুর পর্বতে তিনি আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে যান। তুর পর্বতে আরোহনের পর তিনি আল্লাহর অসীম দয়ার বরকতে পবিত্র তুয়া ময়দানে উপস্থিত হয়ে রেসালত গ্রহণ করেন। হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর নবী এবং রাসূল হিসেবে, সনদ নিয়ে হৃদয় জুড়ে নূরের মশাল জ্বালিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। তখনই আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আ.) স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারুন (আ.)সহ ফেরাউনের মুখোমুখি হয়ে তাওহীদ (আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন একত্ববাদ) প্রচার এবং নিজের রেসালতের স্বীকৃতি দাবী করেন। এর ফলে হযরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে ফেরাউনের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। ফেরাউনের সঙ্গে সাক্ষাতপর্বে হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) নিজেদের নবুয়ত প্রাপ্তির দাবী উত্থাপন করে সমগ্র বিশ্ব জাহানের একমাত্র স্রষ্টা এবং উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান। কথোপকথন কালে হযরত মুসা (আ.) ফেরাউনকে দুটি বিষয় মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। (১) সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং লালন পালনকর্তা একক অবিনশ্বর সত্তা (ইলাহ) আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন, (২) সকল প্রকার জুলুম নির্যাতন অন্যায়, অবিচার থেকে বিরত থাকা এবং বনি ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে ফেরাউনের অত্যাচার, দাসত্ব এবং বন্দী জীবন থেকে মুক্তি দান। ফেরাউনের সঙ্গে কথোপকথনে নানা বিতর্ক হলেও শেষ পর্যন্ত তাওহীদ প্রচারের স্বার্থে হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে মু'জিজা প্রদর্শন করে নবুয়তের প্রমাণ প্রকাশ্যে উত্থাপন করেন। দুঃশাসক ফেরাউন মু'জিজাকে 'জাদু' হিসেবে উল্লেখ করে ফেরাউনী প্রাসাদে উপস্থিত সভাসদকে বিভ্রান্ত করার উদ্যোগ নেন এবং হযরত মুসা (আ.) এর মু'জিজার মোকাবেলায় জাদুকরদের সমাবেশ ঘটানোর হুমকি দেন। হযরত মুসা (আ.) ফেরাউনের জাদুকর সমাবেশের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। ফেরাউন দিনক্ষণ নির্ধারনের দায়িত্ব হযরত মুসা (আ.) এর উপর অর্পন করেন। ফেরাউনের নিকট হযরত মুসা (আ.) এর তাওহীদের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে গমনের অন্যতম কারণ হচ্ছে ফেরাউন যদি আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে তাহলে মিশরের সকল মানুষ ফেরাউনের নির্দেশে ঈমান আনতে বাধ্য হবে। একই সঙ্গে মিশরে বিরাজমান বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা এবং দাসপ্রথা রহিত হবে। আল্লাহর একত্ববাদের অবস্থান এবং মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রচারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। মূলতঃ তাওহীদ প্রচারের জন্য এটি একটি খোদায়ী কৌশল। ফেরাউন এবং হযরত মুসা (আ.) এর পারস্পরিক মতৈক্য অনুযায়ী আল্লাহর অনুপম ইচ্ছায় মিশরের জাতীয় মেলার দিনের মধ্যাহ্ন পূর্ব সময়ের উপর গুরুত্ব প্রদানের হাকীকত হচ্ছে, (১) জাতীয় মেলায় প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে থাকে, (২) দিবসের মধ্যভাগের পূর্বাহ্নে মেলায় সাধারণ মানুষ এবং দর্শকের ঢল নেমে থাকে, (৩) মেলায় জাদুর বিরুদ্ধে মু'জিজার অবিনশ্বর ক্ষমতা সম্পর্কে বিশাল সংখ্যক জনগণের প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ ঘটবে, (৪) দিনের মধ্যাহ্ন ভাগে সূর্যের প্রখর আলো

বিদ্যমান থাকে বিধায় সবকিছু লোক চক্ষুর সম্মুখে সম্পন্ন হবে, (৫) মু'জিজার ঐশী ক্ষমতার সম্মুখে 'জাদু' নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ হযরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে নৈতিক যুদ্ধে ফেরাউনের পরাজয় বরণ, (৬) মেলায় 'মু'জিজা-জাদুর' জয় পরাজয়ের ঘটনা প্রবাহ বিশাল জনসমাগমের কারণে লোক মুখে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে আল্লাহ তাআলার নিজস্ব কাজ (ক) মু'জিজা, (খ) আল্লাহর একক এবং অদ্বিতীয় সত্তার অবস্থান ও শক্তি, (গ) হযরত মুসা (আ.) এর নবুয়তের সত্যতা এবং (ঘ) দুই দাম্ভিক দুঃশাসক ফেরাউনের সীমাবদ্ধতা ও অসার অহংকার সম্পর্কে জনগণ ব্যাপকভাবে অবহিত হবার সুযোগ পাবে। এর ফলে দুঃশাসক ফেরাউনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ভিন্নমত প্রকাশকারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়বে। তাওহীদ প্রচারের লক্ষ্যে হযরত মুসা (আ.) এর দিনক্ষণ নির্ধারণে মেলার সময়কে বাছাই করা ছিল অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ। মহান আল্লাহ জাদুর মোকাবেলায় মু'জিজা প্রদর্শনের মাধ্যমে আম্বিয়া কিরামদের তাওহীদ প্রচারে যেমন সাফল্য দেখিয়েছেন, তেমনি তাওহীদের শাশ্বত বিধান ইসলাম ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে অলি দরবেশদের মাধ্যমে 'কারামত' প্রদর্শন করে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা 'বেলায়তের' মর্যাদাকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতবর্ষে ইসলামের বাণী নিয়ে তাওহীদ প্রচারকালে দুঃশাসক পৃথ্বিরাজের জাদুকরদের মোকাবেলায় সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির (ক.) কারামত প্রদর্শন ইতিহাসে সংযোজিত মূল্যবান অধ্যায় হিসেবে বিশ্ববাসী জ্ঞাত আছেন।

আম্বিয়া কিরামদের মু'জিজা এবং বেলায়তপ্রাপ্ত আল্লাহর অলিদের কারামতে শাব্দিক তারতম্য দৃশ্যমান হলেও এ দুটির মূল উৎস এক-আল্লাহ। মহান আল্লাহ সূরা মুমিন এর ৭৮ নং আয়াতে ঘোষণা করেন, 'হে নবী! আপনার পূর্বে আমি বহু রসূল পাঠিয়েছি। তাদের কারো কারো ঘটনা আপনাকে বলেছি, অনেকের কথা বলা হয়নি। কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন উপস্থাপন করা কোনো রসূলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবেই সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' এই আয়াতে করীমার মাধ্যমে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী রসূলদের মাধ্যমে যে সকল মু'জিজা প্রদর্শন করেছেন তা মহান আল্লাহর অনুমতি এবং নির্দেশনা সাপেক্ষে সম্পন্ন করেছেন। অনুরূপ বেলায়ত ক্ষমতাসম্পন্ন অলি আল্লাহগণ যে সকল কারামত সংঘটিত করেন তাও মহান আল্লাহর অভিপ্রায়, নির্দেশনা এবং অত্যাবশ্যক ইচ্ছার কারণে সম্পন্ন করে থাকেন। মু'জিজা এবং কারামতের মাধ্যমেই তাওহীদবাদীদের ঈমান আক্বিদায় ত্বড়িতাবেগের শক্তি সঞ্চারিত হয়, উদ্দীপনা বেড়ে যায়, মহান আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনিতে মুখরিত হয় সৃষ্টিজগত। এভাবে মু'জিজা এবং কারামতের অসীম প্রভাব ও ক্ষমতা দিয়ে জাদু ও পার্থিব দানবীয় শক্তিকে ধ্বংস, নিয়ন্ত্রণ ও অপদস্থ করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তবে যত্রতত্র খেলাচ্ছলে কারামত প্রদর্শনে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন এবং তা করা বস্তুনিষ্ঠ নয়। কারণ বিষয়টি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার অধীন। মহান আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারী ব্যতীত অন্য কোনো কারণে এ ধরনের ক্ষমতা ব্যবহার করেন না। হযরত মুসা (আ.) এর মু'জিজার সম্মুখে জাদুকরদের মিথ্যা আস্ফালন বিপর্যয়কর পরাজয় বরণ করে। ফেরাউনের জাদুকর দল তখন গ্লানিময় পরাজয় মেনে নিয়ে আল্লাহর দরবারে সিজদারত হয় এবং হযরত মুসা (আ.) এর রেসালতের প্রতি ঈমান আনে। মু'জিজা এবং জাদুর প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় দাম্ভিক ফেরাউনের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফেরাউনী কুটচাল এবং ভণ্ডামী প্রত্যাখ্যান করে মেলায় উপস্থিত ছয় লক্ষ লোক জাদুকরদের সঙ্গে হযরত মুসা (আ.)কে আল্লাহর প্রেরিত নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ঈমান আনে। প্রকাশ্য সমাবেশে তথা মেলার জনস্রোতে তাওহীদ প্রচারের এই কৌশল ব্যাপক সুফল প্রদান করে। জাদুকররা আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ফেরাউন ক্ষিপ্ত হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুক্তি এবং বাস্তবতার সম্মুখে পরাজিত হলে ক্ষমতার মদমত্ততায় উন্মত্ত শাসক ও ব্যক্তিরা যুক্তির পরিবর্তে শক্তির ভাষায় প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে তৎপর হয়ে ওঠে। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভিন্নমত এবং প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে ক্ষমতাসীন শক্তিবানরা নিজেদের শেষ রক্ষার চেষ্টা চালায়। ফেরাউন এ ধরনের নির্মম ক্ষমতাবানদের দলভুক্তদের উপমা হওয়ায় হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) এর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং আনুগত্য স্বীকার করায় স্বীয় স্ত্রী বিবি আছিয়াকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেয়। জাদুকরদেরকে (যারা ঈমান এনেছে) শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। বনি ইসরাইলের ইবাদতখানা বন্ধ করে দেয় এবং ফেরাউনের রাজকীয় নির্দেশে ইবাদতখানাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। এ ধরণের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইসরাইলীদেরকে স্বীয় গৃহে ইবাদত করার জন্য হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) এর ওপর আল্লাহ ওহী নাযিল করেন।

ফেরাউনী শাসনের চরম বর্বরতার মুখে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরাউনী সমর্থকদের উপর বিভিন্ন রকম আযাব নাযিল হতে শুরু করে। প্রথমে দেশময় দুর্ভিক্ষ, এরপর প্লাবনের আযাব, পরবর্তীতে পঙ্গপাল, উকুন ও ঘুনের আযাব, ব্যাঙের আযাব এবং রক্তের আযাব নাযিল করে। প্রতিবার আযাবে নিপতিত হলে ফেরাউন হযরত মুসা (আ.) এর শরণাপন্ন হয়ে

আল্লাহর নিকট মার্জনা ভিক্ষার অনুনয় করে এবং স্বীয় জনগোষ্ঠীসহ ঈমান আনয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বিপদ মুক্ত হওয়া মাত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেরাউন নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে স্বীয় দাম্ভিক আচরণ অব্যাহত রাখে। এ ধরনের দুরাচার থেকে বনি ইসরাইলসহ হযরত মুসা (আ.)কে মুক্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে চরম উদ্ধত ফেরাউন সম্প্রদায়ের ওপর প্লেগ এবং বসন্তরূপ, মহামারীর আযাব নাযিল করে। প্লেগ এবং বসন্ত আক্রান্ত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায়ের সত্তর হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মিশরের ঘরে ঘরে কান্নার রোল, স্বজনহারাদের বুকফাটা আর্তনাদে উদ্বিগ্ন ফেরাউন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিচলিতভাবে হযরত মুসা (আ.) এর নিকট দোয়ার জন্য আগমন করে এবং ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.) দয়ার সাগর। ফেরাউন সমর্থকরা নির্মম, নির্যাতক, বেঈমান, মুনাফিক, পাপাচারী হলেও একই সমাজের বাসিন্দা। প্রতিবেশীদের বিপদঘন পরিবেশ লক্ষ্য করে হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ পেশ করলেন, 'আল্লাহর আযাবে এরা যদি সবংশে নির্মূলই হয়ে যায় তবে তাওহীদের দাওয়াত দিবেন কাদেরকে।' আল্লাহ তাঁর প্রিয় সম্ভাষিত নবী হযরত মুসা (আ.) এর করুণ অথচ সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন ফরিয়াদ কবুল করে ফেরাউন সমর্থকদের আযাবমুক্ত করেন। কিন্তু ফেরাউন সম্প্রদায় হলো নিঃসন্দেহে "নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞ" জনগোষ্ঠী। আযাবমুক্ত হয়ে ফেরাউন সমর্থকরা পুনরায় আল্লাহকে অস্বীকার এবং ইসরাইলীদের উপর আরো নির্মম নির্যাতন শুরু করে।

বার বার ঐশী জলোয়া এবং কুদরতে ইলাহীর অসীম ক্ষমতার হস্তক্ষেপে চরম বিপর্যয়ে পতিত হওয়া সত্ত্বেও ফেরাউন নিজের দাম্ভিক আচরণ এবং পৈশাচিক কর্মকাণ্ড পরিহার করেনি। বরং পোড়া মাটি দিয়ে (ইট) সুউচ্চ প্রাসাদ বানিয়ে অনন্ত অসীম অতুলনীয় ক্ষমতাধর আল্লাহর সন্ধান জেনে নিয়ে আল্লাহর মোকাবিলা করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। পঞ্চাশ হাজার রাজ মিস্ত্রীর কর্মতৎপরতায় সুউচ্চ ভবন কিছুদূর উঠার পর আল্লাহর কুদরতি ঝাপ্টায় ধসে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্যবার হিদায়তের আহ্বান জানানো সত্ত্বেও ফেরাউন তার প্রকৃতিজাত জাহেলী কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেনি। বরং আল্লাহর অবাধ্যতা এবং মানুষের উপর জুলুমই যেন সর্বাবস্থায় দুর্বৃত্ত ফেরাউনের ইবলিশী বৈশিষ্ট্য। ফেরাউন এবং তার অনুগতরা যতবারই আযাবে নিপতিত হয়েছে ততবারই (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং (২) ইসরাইলী জনগোষ্ঠীকে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফেরাউন এবং তার অনুগতরা বার বার প্রতিশ্রুতি প্রদান সত্ত্বেও ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্তির পর প্রদত্ত অঙ্গীকার পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মহান আল্লাহ এ ধরনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, অবাধ্য, হঠকারী প্রবঞ্চক জাতিকে রক্ষার বিষয়ে দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ছাড় দিতে রাজী নন। ফেরাউন এবং তার সমর্থকদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হযরত মুসা (আ.) সমীপে ওহী নাযিল করেন, 'আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, আমার বান্দাদের নিয়ে তুমি রাতের মধ্যেই বেরিয়ে যাও। তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।' (সূরা শো'আরা- আয়াত ৫২)। আল্লাহর নির্দেশের পর হযরত মুসা (আ.) ইসরাইলীদেরকে সঙ্গে করে লোহিত সাগর অতিক্রমের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে নিয়ে যাবার জন্য দ্রুত ছুটে যান। ইসরাইলীদের মিশর ত্যাগের বিষয় অবহিত হওয়ামাত্র ফেরাউন স্বীয় সম্প্রদায়ের বিশাল বাহিনী নিয়ে হযরত মুসার (আ.) পশ্চাদ্ধাবন করে। হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত হয়ে লোহিত সাগরের প্রবহমান অতল জলরাশি অতিক্রমের জন্য লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত করা মাত্র বনি ইসরাইলের বারটি শাখা গোত্রের জন্য বারটি রাস্তা হয়ে যায়। সাগরের জলরাশি প্রতিটি রাস্তার দু'ধারে পাহাড়ের মতো স্থবির হয়ে থাকে। ইসরাইলীদের নিয়ে হযরত মুসা (আ.) লোহিত সাগরে আল্লাহর কুদরতে বিকশিত রাস্তা অতিক্রমকালে ফেরাউন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়। সাগর বক্ষে ১২টি রাস্তা দেখে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। এ দৃশ্য অবলোকন করে ফেরাউন নিজের ঘোড়া সমেত উক্ত রাস্তায় ছুটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউনের সেনাবাহিনীও সাগর পথের রাস্তা অতিক্রমের জন্য নেমে পড়ে। ইতোমধ্যে ইসরাইলী শেষ ব্যক্তিটি ঝাঁপিয়ে পড়ার পর মহান আল্লাহর নির্দেশে সাগরের জলরাশি দ্রুত, প্রবহমান হয়ে যায়। এতে সসৈন্যে ফেরাউনের সলিল সমাধি ঘটে। ফেরাউনের মৃত দেহ হযরত মুসা (আ.) এর প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইলীদের প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ উত্তাল জলরাশির প্রচন্ড ঢেউয়ে লোহিত সাগর তীরে আছড়ে পড়ে। যে স্থানে ফেরাউনের মৃতদেহ আছড়ে পড়েছিল তা এখনো 'জাবালে ফেরাউন' নামে পরিচিত। পবিত্র কুরআনে ফেরাউনের ঘটনাবলী বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ ফেরাউনের দাম্ভিক আচরণ, দুঃশাসন, গণনির্যাতন, মানুষে মানুষে বৈষম্য এবং বিভেদ লালন, দাস প্রথাসহ সামাজিক অনাচারের চিত্র পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করেছেন। মানুষ মাত্রই বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং মৃত্যুদানকারী এবং বিনাশ সাধনকারী। কিন্তু ফেরাউনের সাম্রাজ্যে ফেরাউনের সর্বময় ক্ষমতার দাপট এতোই আধিপত্যপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে, মানব শিশুর প্রজনন, জন্ম মৃত্যু ফেরাউনের নির্দেশ নির্ভর হয়ে পড়েছিল। অথচ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান নানামুখী গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেও

মানুষের জন্ম মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা এবং সময় নির্ণয় করতে পারেনি। ফেরাউন তুল্য দুঃশাসকরা এ ধরণের ক্ষমতা প্রদর্শন করে আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লঙ্ঘন করে চিরকাল আল্লাহ এবং আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির অভিশাপের বোঝা বহন করে চলেছে। ফেরাউনের কার্যকলাপের বর্ণনা এবং পরিণতি থেকে মানব সম্প্রদায়কে শিক্ষা গ্রহণ করে ফেরাউনরূপী জাহেলদেরকে অনুসরণ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

ফেরাউনের জাহেলী শাসন এবং দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ইসরাইলীরা ফিলিস্তিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে ফেরাউনী শাসনাধীনে পরাধীনতা জনিত গোলামীতে লিপ্ত থাকায় ইসরাইলীরা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল, ভীত, অন্যায়ের প্রতিবাদে অক্ষম এমনকি স্রষ্টার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ– এ বোধটুকুও হারিয়ে ফেলে। ইসরাইলীরা ভুলে যায় যে তাদের পূর্ব পুরুষ সুপরিচিত নবী হযরত ইউসুফ (আ.)– যিনি মিশরের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। ইসরাইলীরা দাসশ্রেণীভুক্ত হিসেবে ফেরাউনী তান্ডবে পরিচালিত হওয়ায় মনের দিক থেকে দাসানুদাসের অভ্যাস মুক্ত হতে পারেনি। ফলে ফিলিস্তিন প্রবেশের পথে মন্দিরে প্রতিমা পূজারত একটি সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণবোধ করে। এ সময় হযরত মুসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে অভিশপ্ত ফেরাউনের বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আহ্বান জানান। স্বীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথোপকথনকালে ইসরাইলীরা হযরত মুসা (আ.) সমীপে স্বতন্ত্র কিতাব এবং শরীয়তের ভিত্তিতে আল্লাহর আরাধনার মনোবাসনা পেশ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সম্মতি প্রাপ্ত হয়ে হযরত মুসা (আ.) তুর পর্বতে গমন করে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করেন। হযরত মুসা (আ.) এর অনুপস্থিতিতে হযরত হারুনকে (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের সংশোধন এবং পরিচালনার দায়িত্ব দেন। অন্যদিকে হযরত মুসা (আ.) চল্লিশ রাত তুর পর্বতে অবস্থান করে আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের সম্মতি প্রাপ্ত হন। কথোপকথনকালে হযরত মুসা (আ.) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ পেশ করেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফের ১৪৩নং আয়াতে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আর মুসা নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে হাজির হলেন। তার প্রতিপালক তার প্রতি কথা বললেন। তখন মুসা আবেদন করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক। আমি আপনাকে দেখতে চাই। আমাকে দেখা দিন। আল্লাহ বললেন, হে মুসা! আপনি আমাকে কখনোই দেখতে পারবেন না। তবে আপনি এ পর্বতের প্রতি দেখতে থাকুন। পাহাড় যদি স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে আপনি অবশ্যই আমাকে দেখতে সক্ষম হবেন। অনন্তর তাঁর রব যখন পর্বতের উপর স্বীয় নুরের বিকিরণ ঘটালেন, তা পর্বতকে চূর্ণ বিচূর্ণ (ভস্ম) করে ফেলল এবং মুসা অনুশোচনা প্রকাশ করলেন, 'আপনি মহা পবিত্র আমি আপনার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি এবং আপনাকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমি সব সময় সর্ব প্রথম ঈমানদার।' এরপর মুসা (আ.) এর প্রতি 'তাওরাত' কিতাবসহ শরীয়তের বিধানাবলী নাযিল হয়।

হযরত মুসা (আ.) এর অনুপস্থিতিতে হযরত হারুন (আ.) স্বীয় সম্প্রদায় ইসরাইলকে সংশোধনী নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনা করতে থাকেন। ফেরাউনের মিশর ত্যাগকালে কিবতীদের নিকট থেকে ইসরাইলীরা স্বর্ণসহ যে সকল মূল্যবান সম্পদ ধারকৃতভাবে এনেছিল হযরত হারুন (আ.) তা অবৈধ ঘোষণা করে পুড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। ইসরাইলীরা তা অগ্নিকুণ্ডে পুড়ে ফেলে নিষ্কৃত হলেও ঘটনা প্রবাহে উদ্ভব ঘটে সামেরী নামক এক ব্যক্তির। সামেরী অগ্নিকুণ্ডে গলিত স্বর্ণ দিয়ে গো শাবক তৈরী করে। এটি শব্দকারী হওয়ায় ইসরাইলীদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। চল্লিশ রাত ধরে হযরত মুসা (আ.) এর অনুপস্থিতির সুযোগে সামেরী স্বর্ণের গো শাবককে হযরত মুসার (আ.) ইলাহ এবং ইসরাইলীদের ইলাহ হিসেবে ঘোষণা করে। এতে ইসরাইলীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অনেকে গো শাবক এবং সামেরীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে গো পূজায় লিপ্ত হয়। অন্যদিকে ঈমানদাররা তা থেকে বিরত থাকে এবং হযরত হারুন (আ.) এর নির্দেশ মতো হযরত মুসা (আ.)কে অনুসরণে সময় অতিবাহিত করতে থাকে। কার্যত ফেরাউনের দীর্ঘকালীন অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে সামেরী কর্তৃক গো শাবক পূজা প্রবর্তন করা হলে হযরত মুসার (আ.) সম্প্রদায় ইসরাইলীদের মধ্যে বিভক্তি আসে। হযরত হারুন (আ.) এর বার বার আহ্বান সত্ত্বেও সামেরী এবং তার অনুসারীরা গো শাবক পূজা থেকে বিরত হয়নি। হযরত মুসা (আ.) তুর পর্বত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বীয় সম্প্রদায়কে বিভক্ত দেখতে পেয়ে হযরত হারুন (আ.) এর প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন। তবে হযরত হারুন (আ.) এর মুখে সামগ্রিক অবস্থার বর্ণনা শুনে হযরত মুসা (আ.) নিশ্চিত হন যে তাঁর সম্প্রদায়ের একটি অংশকে সামেরী পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। স্বীয় সম্প্রদায়কে পুনরায় তাওহীদে সমর্পিত করার মানসে হযরত মুসা (আ.) সামেরীর প্রতি বদদোয়া প্রদান করেন এবং গো শাবক মূর্তিটি জ্বালিয়ে ফেলে ভস্ম নদীতে ভাসিয়ে দেন। সামেরীর দুর্দশা এবং গো শাবক মূর্তির ভস্ম লক্ষ্য করে পথভ্রষ্ট ইসরাইলীরা তওবা করে পুনরায় হযরত মুসার (আ.) প্রতি ঈমান আনে। হযরত মুসা (আ.) তাদের জন্য মাগফিরাত কামনার বিনিময় হিসেবে এবং শাস্তিস্বরূপ প্রায় সত্তর হাজার ইসরাইলী পরস্পরকে হত্যার নির্দেশ দেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ক্ষমা প্রাপ্তির পর হযরত মুসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে তাওরাত এবং বিধিবদ্ধ শরীয়ত সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে বক্র মনের অধিকারী ইসরাইলীরা সরল বিশ্বাসে হযরত মুসা (আ.) এর সুসংবাদের প্রতি ঈমান আনেনি। তারা হযরত মুসার (আ.) কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে। তারা কিতাবটি আল্লাহ প্রদত্ত কিনা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলে, 'এমন কিতাব আপনি, নিজে লিখেও বিলিয়ে দিতে পারেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের হঠকারীতাপূর্ণ বক্রোক্তি এবং কুতর্কের কারণে হযরত মুসা (আ.) খুবই ক্ষুব্ধ হন। ফলে স্বীয় সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন প্রতিনিধি নিয়ে তুর পর্বতে উপস্থিত হবার জন্য হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হন। সত্তর জন পুরুষ প্রতিনিধিসহ হযরত মুসা (আ.) যাত্রা শুরু করলে ভূ কম্পন শুরু হয়। কিন্তু হযরত মুসা (আ.) এর প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক ভূ কম্পন রহিত করেন। এরপর হযরত মুসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের ৭০জন প্রতিনিধিসহ তুর পাহাড়ে উপনীত হন। ইসরাইলী প্রতিনিধিদল তুর পাহাড়ে পৌঁছার পর মেঘমালার অন্তরালে মহান আল্লাহ হযরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলে স্বজাতির লোকদের বড়শির মতো বক্রস্বভাবের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহকে নূরের পর্দার অন্তরালে বাক্য বিনিময়ের ফরিয়াদ জানান এবং তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়। নূরের পর্দায় পরিবেষ্টিত প্রতিনিধিবর্গ প্রত্যেক হযরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। নূরের পরিবেষ্টন মুক্ত হবার পর ইসরাইলীরা হযরত মুসা (আ.) এর নিকট আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি দেখার দাবী উত্থাপন করে। হযরত মুসা (আ.) চর্ম চোখে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় বলে তাদের অবহিত করেন। এরপরেও ইসরাইলীদের বাড়াবাড়ির পর্যায়ে আল্লাহর জালালিয়াতের গগণবিদারী ধ্বনিতে সত্তর জন প্রতিনিধি প্রাণ হারায়। তুর পর্বতের পাদদেশে সত্তর জন ইসরাইলী প্রতিনিধির মৃত্যু বরণে হযরত মুসা (আ.) খুবই ব্যথিত হয়ে তাদের পুনর্জীবন দানের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে মুনাজাত করেন। আল্লাহ রহমানুর রহিম অনন্ত দয়ায় হযরত মুসা (আ.) এর ফরিয়াদ কবুল করেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ৫৫-৫৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আর যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা! আমরা আল্লাহকে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করবনা।' তখন আকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তোমরা নিস্প্রাণ হয়ে গেলে। সে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে আমি তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে পার।' ইসরাইলী প্রতিনিধিবর্গ ফিরে এসে হযরত মুসা (আ.) এর সত্যনিষ্ঠ নবুয়তের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে তাওরাত কিতাবের আদেশ সাধ্যমত কার্যকর এবং পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ বক্রস্বভাব এবং কুতর্ককারী ইসরাইলীরা এ ধরনের কঠিন বিধান মানতে অস্বীকৃতি জানায়। ইসরাইলীদের হঠকারীপূর্ণ জবাব এবং স্বভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ.) তুর পর্বত ইসরাইলীদের শিরোপরি জ্বলন্ত অবস্থায় তুলে ধরলে আতংকিত হয়ে গত্যন্তর না দেখে তাওরাত কিতাবের প্রতি তারা ঈমান আনে। এরপর মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পবিত্র ভূমির উপর ইসরাইলীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য হযরত মুসা (আ.)কে আহ্বান জানান। কিন্তু ভীরু এবং কাপুরুষ, কপট এবং বক্র স্বভাবের ইসরাইলীরা বিনা শ্রমে সব কিছু হাতের নাগালে পেতে আগ্রহী। পবিত্র ভূমিতে এ সময়ে অবস্থানরত দুর্ধর্ষ আমলেকা বংশের উজ বিন ওনক নামের কল্প চরিত্র এক বিশাল মানবের কথা শুনে ইসরাইলীরা যুদ্ধ করে পবিত্র স্থানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে হযরত মুসা (আ.) এর প্রস্তাবে অসম্মত হয়। হযরত মুসা (আ.) এ সময় স্বীয় সম্প্রদায়ের কর্মকান্ডে খুবই বিরক্ত হন। তখন সন্দেহপ্রবণ, ভীত, অকৃতজ্ঞ ইসরাইলীদেরকে হযরত মুসা (আ.) এর ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক চল্লিশ বছর ধরে তীহ প্রান্তরে বন্দী করে রাখেন।

তীহ প্রান্তরে শাস্তিমূলক বন্দী জীবন কালেও আল্লাহ ইসরাইলীদেরকে তাঁর রবুবিয়াতের অবারিত দয়া থেকে বিমুখ করেননি। হযরত মুসা (আ.) এর দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঘরবাড়ি লতা পাতা হীন গাছপালা শূন্য তীহ প্রান্তরে সাদা মেঘের ছায়া দিয়ে করুণাময় আল্লাহ ইসরাইলীদেরকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করেন। তীহ প্রান্তরে ফসল উৎপন্ন হতোনা বিধায় খাদ্য সংকট দেখা দিলে হযরত মুসা (আ.) এর প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ অকৃতজ্ঞ স্বভাবের ইসরাইলীদের জন্য পৃথিবীর বুকে মান্না সালওয়া অবতরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অলস ও অকৃতজ্ঞ ইসরাইলীরা এ ধরনের তৃপ্তিদায়ক খাবার কষ্ট করে প্রতি দিন যথাসম্ভব সংগ্রহ করতেও অলসতা প্রকাশ করে। প্রতি দিনের পরিবর্তে একদিনেই তারা কয়েক দিনের খাবার সংগ্রহ করে জমা করে রাখে। ফলে খাবারে পচন ধরে। মহানবী (দ.) বলেছেন, 'বনি ইসরাইল না হলে কখনো খাদ্য দ্রব্য পচত না।' আল্লাহ তাঁর স্বীয় কুদরতে ইসরাইলীদের জন্য রাতে চলাচল ও কাজকর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে আলোর ব্যবস্থা, পরিধানের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা, নিত্যব্যবহার ও জীবন রক্ষার জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইসরাইলীদের অকৃতজ্ঞতা বন্দী দশায়ও বলবৎ ছিল। তারা নিজেদের নবী সম্পর্কে দৈহিক ত্রুটি জনিত অপবাদ আরোপ করে নিজেদেরকে অবিবেচক জনগোষ্ঠী

হিসেবে নানা ঘটনার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় আলোচ্য সম্প্রদায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিদিন মান্না সালাওয়া খাদ্য গ্রহণে অরুচি প্রকাশ করায় স্তম্ভিত হন হযরত মুসা (আ.)। তিনি ইসরাইলীদেরকে ভূমিতে উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহে নিকটবর্তী শহরে গমন করতে বলেন। ইসরাইলীদের এ ধরনের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে মান্না সালওয়া অবতরণ বন্ধ হয়ে যায়। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত মুসা (আ.) এর অসন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটলে এই জনগোষ্ঠী আল্লাহর স্থায়ী গজবের যোগ্য হয়ে পড়ে। হযরত মুসা (আ.) এর সময়ে ইসরাইলী এক লোভী দরিদ্র যুবক কর্তৃক চাচাত বোনকে বিয়ের মাধ্যমে চাচার সম্পত্তি দখলের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। চাচা এ বিষয়ে অমত প্রকাশ করলে লোভী যুবক চাচাকে নির্জনস্থানে রাতের আঁধারে হত্যা করে। এ নিয়ে ইসরাইলী সম্প্রদায়ের মধ্যে গোত্রীয় কলহ দেখা দেয়। পারস্পরিক দোষারোপের কারণে গোত্রীয় যুদ্ধ, অবধারিত হয়ে পড়লে হযরত মুসা (আ.) এর পরামর্শে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণের গাভী যবাইয়ের মাধ্যমে হত্যাকারী চিহ্নিত করণের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এ নিয়েও হযরত মুসা (আ.) এর প্রতি বক্রস্বভাবের ইসরাইলীদের নানামুখী প্রশ্নের অন্ত ছিলনা। তবে পরবর্তী সময়ে গাভী যবেহ করার মাধ্যমে হত্যাকারী নির্দিষ্ট হয় এবং ইসরাইলীদের অন্তকলহের নিষ্পত্তি ঘটে।

গাভী যবেহ বিষয়ে তাফসীরকারকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেছেন। উল্লেখ্য যে হযরত মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে অবস্থান কালে ইসরাইলীরা সামেরী কর্তৃক পথভ্রষ্ট হয়ে গো শাবক পূজায় লিপ্ত হয়। মহান আল্লাহর পরিবর্তে সামেরীর পরামর্শে গো শাবক পূজা শুধু শিরিক নয় বরং তাওহীদকে অস্বীকার করে হযরত মুসা (আ.) এর নির্দেশিত পথ থেকে ইসরাইলীরা বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যুবক কর্তৃক চাচা হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গো যবাইয়ের নির্দেশনার অর্থ হচ্ছে সামেরী কর্তৃক প্রবর্তিত গো পূজার প্রতি আক্ষরিক অর্থে ইসরাইলীদের অস্বীকৃতি আদায়। অর্থাৎ যে ইসরাইলীরা মিশরে অবস্থানকালে সামেরীর আহ্বানে গো পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তারাই গাভী যবাই করে গো পূজা বিরোধি অবস্থানের প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়। তাফসীর কারকদের মধ্যে সময়কাল সম্পর্কে ভিন্নমত থাকলেও বালআম বিন বাউরার অহংকার বশত বাড়াবাড়ির ঘটনা, কৃপণ কারুনের ধন বিলাসী চরম অহমিকা এবং পরবর্তীতে ধ্বংস প্রাপ্তির কাহিনীর কারণে হযরত মুসা (আ.) এর নবুয়তকাল নিঃসন্দেহে ঘটনা বহুল। হযরত মুসা (আ.) এর নবুয়ত, নবী হিসেবে হযরত হারুন (আ.) এর অবস্থান, অকৃতজ্ঞ জনগোষ্ঠী ইসরাইলীদের সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন মানব জাতির বিকাশ সাধন, বিশুদ্ধ মানব চরিত্র অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে 'সবক' প্রদান করেছে। হযরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে হযরত খিজির (আ.) এর পরিচয় এবং সংঘটিত ঘটনাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে অনন্ত অসীম অজ্ঞাত জ্ঞান সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেছেন। আল্লাহ হযরত খিজির (আ.) এবং হযরত মুসা (আ.) এর মাধ্যমে জ্ঞানের অসীমতা ও সসীমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন।

হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার কারণ হচ্ছে (১) আসমানী কিতাব তাওরাত তাঁর উপর নাযিল হয়, (২) ইলমে শরীয়তের বিস্তৃত বিষয় তাঁর মাধ্যমে প্রচার হয়, (৩) ইলমে বাতিনের বিষয় তাঁর সময় হযরত খিজির (আ.) এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, (৪) ফেরাউনের মতো জালেম শাসকের স্বেচ্ছাচারী চরম কর্তৃত্ব প্রবণতা, রাষ্ট্র শাসনে কুটিলতা সম্পর্কে এবং এ ধরনের দুর্বৃত্তের পরিণতি সম্পর্কে মানব জাতিকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়, (৫) শাসক কর্তৃক মানুষের মানব অধিকার হরণ করে দাস সৃষ্টির ঘটনাবলীও হযরত মুসা (আ.) এর জীবন চরিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, (৬) পার্থিব সম্পদের অহমিকার পরিণতি সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয়েছে কৃপণ কারুন সম্পর্কে আলোকপাত করে। পৃথিবীতে এখনো কৃপণরা 'কারুন' নামে তিরস্কৃত হয়। (৭) একটি অস্থির, কপট, ভন্ড জন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাওহীদ প্রচারে কংকটাকীর্ণ পথ অতিক্রমের বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে, (৮) সর্বোপরি রবুবিয়াত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুসা (আ.) এর জীবন চরিতে মানব জাতির নানামুখি সংঘাত, পক্ষ, প্রতিপক্ষ, কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর করুণাধারা অব্যাহত থাকার বিষয়ে ধারনা প্রদান করা হয়েছে। মানব চরিত্রের কপটতা, ভণ্ডামী, ধুর্তামি, অসততা প্রভৃতি সম্পর্কে মানব সমাজকে জ্ঞাত করে অত্যন্ত সতর্ক জীবনাচারে অভ্যস্ত হতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, (৯) তাওহীদ প্রচারের জন্য জন সমাগম স্থল অত্যাবশ্যক।

হযরত মুসা (আ.) মিশরের জাতীয় মেলায় সমবেত বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফেরাউনী জাদুকরীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একক অদ্বিতীয় মহান সত্তা আল্লাহর ক্ষমতা 'মু'জিজার' বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এতে একদিনেই ছয় লক্ষ মানুষ হযরত মুসা (আ.) এর প্রতি ঈমান আনে। একই সঙ্গে জালেম স্বৈরশাসক ফেরাউনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করে। ব্যাপক লোক সমাগমের মধ্যে তাওহীদ প্রচারের নিয়মটি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে অনুসৃত হয়। **(চলবে)**

তাসাউফ সাহিত্যে ব্যবহৃত চল্লিশ হাদিস ও প্রাসঙ্গিকী

• অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী •

সূচনা: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা হাবিবিহিল করিম, আম্মা বা'দ– পবিত্র ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গতা বিধানকারী বিষয় হলো তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি। এ বিষয়ে আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে নানা ধরণের কিতাব, গ্রন্থ ও সাহিত্য। তাসাউফের বহুবিধ গ্রন্থ রচিত হলেও সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি কিতাব। তন্মধ্যে হযরত গাউসুল আযম পীরানে পীর দস্তগীর সৈয়দ আবদুর কাদের জীলানী (ক.) কর্তৃক বিরচিত আরবি 'গুনিয়াতুত্ তালেবীন', হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহাম্মদ গজ্জালী (ক.) বিরচিত 'এহ্ইয়াউল উলুম' এবং 'আইনুল ইলম' এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাসান মুজাদ্দেদী ফারুকী (ক.) বিরচিত 'তরীকুন্নাজাত' কিতাব সমূহ অবলম্বনে কতিপয় হাদিস শরীফ অত্র প্রবন্ধে স্থান লাভ করেছে। এর সংখ্যা চল্লিশ। স্মরণ রাখলে মর্যাদাবান হবে ও নবীর শাফায়াত মিলবে।

সাহিত্য মানে ইংরেজীতে লিটারিচার, আরবিতে আদব। মাদরাসায় আমাদের অধ্যয়নকালে ফাজিল শ্রেণীতে তাসাউফ বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যভূক্ত করা ছিল। আমার বিষয়ও তা ছিল। তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধিতা বিদ্যার মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদিস। এ বিদ্যাটি শিক্ষা, সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করে নিতে হয়। এ লক্ষ্যে একজন যোগ্য মুরশীদ বা পথ প্রদর্শকের শরণাপন্ন হতে হয় যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিশারদ, সুন্নী আক্বিদা সম্পন্ন।

তাসাউফ সাহিত্য রচনাকারী মনীষীগণ শরিয়ত, তরিকৃত, হাকিকত, মারিফাত জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাঁরা যে সব হাদিস চয়ন করেছেন তা সবই বিশুদ্ধ। তদুপরি আমলের ক্ষেত্রে জয়িফ বা দুর্বল হাদিসকেও গ্রহণ করা যায়। জাল হাদিস হলো যেগুলো বর্ণক ধারাক্রম বিচ্ছিন্ন বা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাকারীর বর্ণনা হয়। হাদিস সংকলনের সঠিক ইতিহাস জানা থাকলে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বিভ্রান্তি বা ধাঁধা সৃষ্টি হবেনা। আবার কোন বিশুদ্ধ হাদিসকে কেউ অস্বীকার কিংবা তৎ সম্পর্কে কোন অভিযোগ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা বরং তার জবাব দানের মাধ্যমে অভিযোগ খণ্ডন করতে হবে। সূফীবাদী মহাত্মাগণ এ সম্পর্কে খুবই সচেতন। কবির ভাষায় বলতে হয়– সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া, কুজনে কুযশ গায় সুযশ নাশিয়া।

তাসাউফ গ্রন্থাদিতে বিবৃত কিছু বিষয় ভিত্তিক হাদিস শরিফ উপস্থাপন করা হচ্ছে– হযরত গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী কাদ্দাসাল্লাহু ছিররাহুল আজিজ বিরচিত 'গুনিয়াতুত্ তালেবীন' কিতাব হতে সংকলিতঃ

১. মস্তক মুণ্ডন সম্পর্কিত হাদিস: 'আন ইবনি আব্বাছিন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা আন্নাহু ক্বাল আল্লাজী ইয়াহলিকু ফিল মিছরি খলীকান বিশ শাইতান' অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে ব্যক্তি মস্তক মুন্ডন করে সে শয়তানের স্বভাবগ্রস্ত। উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হযরত গাউছে পাক বলেন– কেননা মাথা মুন্ডন করা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনুরূপ। কথাটি তিনি অপর হাদিস দ্বারা বুঝিয়ে বলেছেন যে রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন, 'মান তাশাব্বাহা বি কাউমিন ফাহুআ মিনহুম' অর্থ- যে ব্যক্তি নিজের আকৃতি-প্রকৃতি ভিন্ন জাতির অনুরূপ গড়বে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। হজ্ব, ওমরা ও রোগাক্রান্ত ব্যতীত মাথা মুণ্ডন বিদা'ত।

২. নামাজে মন বসানো: হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত তাঁকে রাসূলে পাক (দ.) বলেন, লাইছা লাকি মিন সালাতিকি ইল্লা মা হাদ্বারা ফিহী ক্বালবুকি' অর্থ-নামাজ পড়ার সময় নামাজের মধ্যে নিজের অন্তরকে নিবিষ্ট রাখার চাইতে তোমার জন্য আর কোন উত্তম বস্তু নেই।

৩. মুজাহাদা সম্পর্কে: আল্লাহর পথে পরিশ্রম করা বা আধ্যাত্মিক সাধনাকে মুজাহাদা বলে। এ বিষয়ে হযরত গাউসে পাক বলেন, মুজাহাদা মুরাকাবা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়টিকে রাসূলে পাক (দ.) হাদিসে জিবরাঈলের মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলে পাক (দ.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ইহসান' কী? তিনি উত্তরে বলেছিলেন 'ইহসান' হলো এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো, আর যদি তুমি তাকে দেখতে অক্ষম হও তাহলে এটাই ধারণা করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। উক্ত হাদিসের অন্তর্নিহিত ভাবধারা অবলম্বনে হযরত গাউসে পাক (ক.) বলেন, আল্লাহর বান্দা মুরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহর সদয় দৃষ্টিকে বান্দার দিকে আকৃষ্ট করার অর্থ হলো বান্দাকে তার জ্ঞান অনুযায়ী সদা সর্বদা আল্লাহর অনুগত থাকা আবশ্যক।

মুরাকাবা হলো প্রত্যেক সৎকর্ম তথা ইবাদতের মূল।

৪. সবর প্রসঙ্গে: সবর বা ধৈর্য হলো তাসাউফ সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সম্পর্কে হযরত গাউসে পাকের চয়নকৃত হাদিসগুলোর মধ্যে একটি হলো হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন কোন বিপত্তি বা আঘাত পাওয়ার সময় সবর বা ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।' আরো হাদিসে বর্ণনা এসেছে জনৈক ব্যক্তি এসে নবী করিম (দ.) এর দরবারে আরজ করলেন যে, আমার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে আর রোগ আমার দেহকে দুর্বল ক্ষীণকায় করে ফেলেছে। নবী করিম (দ.) ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তির মাল সম্পদ ধ্বংস হয়ে না যায় আর যাকে কোন রোগ ব্যাধি কষ্ট দেয়না তার মধ্যে কোন সৌন্দর্য ও পূণ্য নাই। কেননা এতে সবর করার অবকাশ থাকে।

৫. সৎস্বভাব সম্পর্কে: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত তিনি হযরত রাসূলে পাক (দ.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে কোন ব্যক্তি উত্তম? উত্তরে বললেন, সৃষ্টির মধ্যে সেই উত্তম যার চারিত্রিক সদগুণাবলী রয়েছে। সদস্বভাব বিলায়ত অর্জনের পূর্বশর্ত।

৬. দান করে ফেরত নেয়া প্রসঙ্গে: রাসূলে পাক ইরশাদ করেন, আল আয়েদু ফী হিবাতিহি কাল কালবি ইয়াক্বিউ চুম্মা ইয়াউদু ফীহে। অর্থ- যে নিজের দানকে ফিরিয়ে নেয় তার দৃষ্টান্ত হলো কুকুরের মতো, সে বমি করে ফেলে দেয় আবার তার দিকে ফিরে যায়, অর্থাৎ আবার তা খেয়ে নেয়। (পৃ. ৭৯২)

৭. নামায ও দোয়া প্রসঙ্গে: হযরত আনাস বিন মালিক (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন ইমাম যখন তার মিহরাবে দাঁড়ায় আর কাতার সোজা হয় তখনি আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে। প্রথমে ঐ রহমত ইমামের উপর পৌছে। পরে ইমামের ডান পাশে দাঁড়ানো মুসল্লিদের উপর পৌছে। অতঃপর বাম পাশের লোকদের উপর পৌছে। এরপর জামাতে উপস্থিত সকল মুসল্লির উপর ঐ রহমত ছেয়ে যায়, আর ফিরিস্তা আহ্বান করেন যে, অমুক ব্যক্তি লাভবান হয়েছে আর অমুক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং লাভবান ঐ ব্যক্তি যে নিজের দুটি দোয়ার হাত আল্লাহর সম্মুখে প্রলম্ব করেছে আর ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে দোয়া-মুনাজাত করা ব্যতীত মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। যখন সে ব্যক্তি হাত তুলে দোয়া মুনাজাত করা ব্যতীত মসজিদ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন ফিরিস্তারা বলেন যে, ওহে অমুক ব্যক্তি! তুমি আল্লাহর রহমত হতে বেপরওয়া বা নির্ভিক হয়ে গেলে; তাঁর রহমতের ভাণ্ডারে তোমাকে দান করার মতো কি কিছু ছিলনা? (পৃ. ৭৫৫)

৮. আইয়ামে বীজের রোজা প্রসঙ্গে: বর্ণনাকারীদের সূত্রক্রম সহকারে হযরত গাউসে পাক (ক.) লিপিবদ্ধ করেন যে, হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু নসর তার পিতা হতে, তিনি হিলাল বিন মুহাম্মদ হতে, তিনি হুসাইন বিন সুফিয়ান হতে, তিনি সুলায়মান বিন ইয়াজিদ হতে, তিনি মাওলা বিন হাশিম হতে, তিনি আলী বিন যায়িদ হতে, তিনি আব্দুল মালিক বিন হারুন থেকে, তিনি সায়িদ বিন উসমান থেকে, তিনি আলি বিন হুসাইন থেকে, তিনি আলি বিন আবি তালিব থেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, (চান্দ্রমাসের) তের তারিখের রোজা তিন হাজার বছর রোজার সমপরিমাণ সওয়াবতুল্য, চৌদ্দ তারিখের রোজার সওয়াব দশ হাজার বছরের রোজার সমতুল্য, আর যে ব্যক্তি পনের তারিখে রোজা রাখল তাহলে সে একলক্ষ তের হাজার বছর সমপরিমাণ রোজা রাখার সওয়াব পাবে। অপর এক হাদিসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (দ.) আইয়ামে বীজের রোজা নিজ আবাসে কিংবা প্রবাসে কখনো বর্জন করতেন না। (গুনিয়া- ৫৯০ পৃ.)

৯. শিষ্টাচার প্রসঙ্গে: হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন রাসূল পাক (দ.) হযরত ফাতিমা (রা.) এর নিকট তশরিফ নিতেন তখন হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূলে পাকের সম্মানার্থে বসা থেকে উঠে দাঁড়াতেন আর রসূলে পাকের হস্ত মুবারকে চুমু দিতেন এবং নিজের আসন শরীফে তাঁকে বসাতেন। রাসূলে পাক (দ.) দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর হাত মুবারকে চুমু দিতেন আর নিজ আসন শরীফে বসাতেন। (গুনিয়া-২৯ পৃ.) অপর হাদিসে রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের নিকট সমাজের কোন ওলী-বুজুর্গ ব্যক্তির শুভাগমন হয় তাহলে তোমরা তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো, এ ধরণের সম্মান প্রেম-ভালবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর বলেন, নেককার ওলী-সালেহীনদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং তাদেরকে হাদিয়া তোহফা প্রদান করা একটি আদব বা শিষ্টাচারিতা। আর গুনাহগার পাপী ব্যক্তিদের

সম্মানার্থে দাঁড়ানো মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। (গুনিয়া- ২৯পৃ.)

১০. শয়তান ভীত হওয়া প্রসঙ্গে: রাসূলে পাক (দ.) হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, 'ইন্নাশ শাইতানা ইয়া ফিররু মিন জিল্লিকা ইয়া ওমারু' অর্থ ওহে ওমর! শয়তান তোমার ছায়া থেকে পর্যন্ত পালিয়ে যায়'। (পৃ. ১৮৭) অপর হাদিসে আছে হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি.) নিজের বৃদ্ধাবস্থায় দোয়া প্রার্থনা করতেন, ওহে আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই যে, আমাকে যিনা (ব্যভিচার) এবং হত্যা করা থেকে সুরক্ষিত রাখ। লোকেরা বলল, আপনি এই বৃদ্ধাবস্থায় যিনা ও খুন করা থেকে ভয় করতেছেন? উত্তরে তিনি বললেন ভয় করবনা কী করে? শয়তান তো এখনো জীবিত আছে। (গুনিয়া- ১৮৮পৃ.)

১১. জিহাদে আকবর সম্পর্কে: রাসূলে পাক (দ.) যখন তাবুকের যুদ্ধ সমাপ্ত করে ফিরে আসলেন তখন ইরশাদ করলেন, রাযা'না মিনাল জিহাদিল আসগারি ইলাল জিহাদিল আকবারি' অর্থ, আমরা ক্ষুদ্রতম জিহাদ থেকে বৃহত্তম জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর (ক.)এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, এতদস্থলে জিহাদে আকবর বা বৃহত্তম জিহাদ বলতে রাসূলে পাক (দ.) নফস এবং শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার কথাই বুঝিয়েছেন। কেননা এ ধরণের জিহাদের সময় কাল ও ব্যাপ্তি অনেক দীর্ঘ, সুদূর প্রসারী। নফস ও শয়তানের ভয়াবহতা ও আশঙ্কা একেবারে শেষ জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই তজ্জন্য সতর্ক থাকতে হবে। (গুনিয়া- ১৯৯পৃ.)

ইমাম গাজ্জালী (ক.) বিরচিত 'আইনুল ইলম' থেকে চয়নকৃত হাদিস: বিশ্বখ্যাত ইসলামী মনীষী ও দার্শনিক হযরত ইমাম গাজ্জালী (ক.) বিরচিত তাসাউফ সাহিত্য আইনুল ইলম (আরবী) হতে বিষয় ভিত্তিক কিছু হাদিস শরীফের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

প্রভুর ধ্যান মগ্ন হওয়া:

১. 'তাফাক্কারু' ছায়াতিন খাইরুম মিন ইবাদাতি ছিত্তিনা সানাহ, অর্থ, অল্পক্ষণের যিকির বা আল্লাহ সম্পর্কে অথবা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে ধ্যানমগ্ন ও চিন্তা-ভাবনা করা ষাট বছরের ইবাদতের চাইতেও উত্তম। উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম গজ্জালী (ক.) বলেন তাফাক্কারু বা চিন্তা-ভাবনার অর্থ হলা মারিফাত বা আত্মজ্ঞান অর্জন করা (পৃ.৩২)।

২. গভীর রাতে নামাজ: রাকআতানে ফী জাউফিল্লাইলি খাইরুম মিনাদ্দুনিয়া ওয়ামা ফিহা' অর্থ মধ্যরাতে নিদ্রাত্যাগ করে জাগ্রত হয়ে দু' রাকাত নামাজ আদায় করা সমগ্র বিশ্ব ও তম্মধ্যে যা কিছু আছে সে +সমুদয় হতে উত্তম।

৩. নীরবতা পালন: ইন্না আকচারা খাতায়া ইবনি আদামা ফী লিছানিহী অর্থাৎ, সন্দেহাতীতভাবে অধিকাংশ পাপ তাদের জিহ্বা বা রসনার মধ্যে নিহিত আছে। উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম গাজ্জালী (ক.) বলেন, সুতরাং নীরবতা পালনের মধ্যে রয়েছে মাহাত্ম্য ও পদমর্যাদা (পৃ. ৬০)

৪. সূফীতাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন: ইজা দাখালান্নুরু ফিল ক্বালবী ইনশারাহা অর্থ কলব বা অন্তরে যখন নূর সৃষ্টি হয় তখন উক্ত কলব উন্মুক্ত হয়ে যায়, উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম গজ্জালী (ক.) বলেন, অদৃশ্য বস্তুসমূহ তখন তিনি দেখতে পান, তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। (পৃ. ৭)

৫. তালাবুল ইলমে ফরিদ্বাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতিন, অর্থ- ইলম বা জ্ঞানঅন্বেষণ করা ফরজ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম গাজ্জালী (ক.) বলেন এখানে ইলম বলতে মারিফাত বা খোদা পরিচিতি জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান নয়। (পৃ. ৯)

৬. নবী প্রেম: লা ইউমিনু আহাদাকুম হাত্তা ইয়াকুনাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আহাব্বা ইলাইহি ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট খোদা ও নবী প্রেম তারা ব্যতীত সর্ব সৃষ্টির চাইতেও অত্যধিক হবেনা। উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম গাজ্জালী (ক.) বলেন, একজন মুমিনের নিকট খোদা ও নবী প্রেম, আল্লাহ-রাসূলের প্রেম-ভালবাসা-মুহাব্বত সমগ্র বিশ্বে, বিশ্বস্থিত সর্ব বস্তু, পরকালের সব কিছু হতে অত্যধিক হতে হবে। নতুবা সে মুমিন হবেনা। মুমিনের নিকট কোন বস্তুর স্বাদ-আস্বাদ আল্লাহ-রাসূলের মুহাব্বত ও মারিফাত স্বাদের চাইতে বেশী স্বাদযুক্ত হতে পারে না। (পৃ. ১৩৮)

৭. ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা: হাদিসে পাকে আছে, আশাদ্দুন্নাছি আজাবান ইয়াউমাল কিয়ামাতি আলেমুন লাম ইয়ান ফাউহুল্লাহু বিইল্‌মিহি ' অর্থ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানব মন্ডলীর মধ্যে সর্বাধিক আজাব বা শাস্তির মধ্যে

নিমজ্জিত থাকবে ঐ আলেম বা জ্ঞানী যাকে আল্লাহ তায়ালা তার ইলম দ্বারা কোন কল্যাণ পৌছায়নি। উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম গাজ্জালী (ক.) বলেন, সত্য ফতোয়াবাজী হতেও বেঁচে থাকা চাই। কেননা প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কিরাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে ফতোয়া দাতার সংখ্যা ছিল মাত্র তের থেকে উনিশ জন। উক্তিটির সমর্থনে তিনি হাদিস পেশ করেছেন, লা ইউফতা ইল্লা আমীরু আউ মামুরু আউ মুতাকাল্লিফুন ওয়াল ইছতিবসার। মুমিনদের আমীর অথবা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অথবা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এ পদবী অর্জন করেছেন এসব লোক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যেন ফতোয়া না দেন (ফতোয়া হলো সমস্যাদির ধর্মীয় সমাধান) (আইনুল পৃ. ১০)

৮. পবিত্রতা সংক্রান্ত: আত তুহুরু নিসফুল ইমান অর্থ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক, হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা গাজ্জালী (ক.) লিখেন পবিত্রতার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো আত্মার পবিত্রতা। তাকে তাজকিয়ায়ে নফছও বলা হয়। (পৃ. ১৭)

৯. নামাযে মনোনিবেশ সংক্রান্ত: লা ইয়ানজুরুল্লাহু ইলা সালাতিন লা ইউহ্বিরুর রাজুলু ফীহা কলবাহু মায়া বাদানিহি' অর্থ আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তির এমন নামাজকে দেখেনও না (কবুলের দৃষ্টিতে) যে নামাযের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আপন কলবকে নিজের দেহের সাথে উপস্থিত রাখেনা। উক্ত হাদিসের মর্মার্থের সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের কথাও ইমাম গাজ্জালী (ক.) বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজে একটি সিদ্ধান্তে পৌছে বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নামাযে হুজুরী কলব বা আত্মার উপস্থিতি পাওয়া যাওয়াটা অসম্ভব; কিন্তু জেনে রেখো আল্লাহর আওলিয়া, বুজুর্গ মনীষীগণ যারা উর্ধ্ব জগতের সব কিছু প্রত্যক্ষ করে থাকেন তাদের নামাজরত অবস্থায়। বিশেষতঃ তাদের সিজদা অবস্থায়তো আল্লাহর নৈকট্য অধিকহারে অর্জিত হয়। আর সেটা হয়ে থাকে নিজ নিজ আত্মার বিশুদ্ধতার দিক বিবেচনায়। (পৃ. ২৩)

১০. ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে: হাদীসে পাকে আছে, আবগাদুর রিজালে ইলাল্লাহি আল আশাদ্দু খাসীম অর্থ সমগ্র মানবের মধ্যে আল্লাহর অভিশম্পাত প্রাপ্ত সে ব্যক্তি যে কঠোরতরভাবে ঝগড়া বিবাদকারী হয়। অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম গাজ্জালী (ক.) বলেন, এ ধরণের কটুবাক্য ব্যবহার হারাম বা নিষিদ্ধ। কিন্তু এ ধরণের মজলুম-নির্যাতিত মানুষের পক্ষে তর্ক-বিতর্ক বৈধ হবে যার হক্ব বা প্রাপ্যতা দাবির পক্ষে শরীয়তের বিধান কার্যকর হয় এবং তার ত্বরীকার অনুবর্তীও হয়। (পৃ. ৬২)

১১. লৌকিকতা সম্পর্কে: রাসূলে পাক (দ.) বলেন, আহলুর রিয়ায়ে ইউয়াজজিবুনা বিন্নারে, অর্থ- রীয়াকার বা লোক দেখানো ইবাদতকারীকে আযাব দেয়া হবে দোযখের আগুনে (পৃ. ৮৭)

১২. লজ্জা বিষয়ে হাদিস: আল হায়াউ খাইরুন কুল্লুহু, অর্থাৎ হায়া বা লজ্জা সবটুকুই উত্তম।

১৩. আল হায়াউ শু'বাতুম মিনাল ঈমান, অর্থ হায়া বা লজ্জা ঈমানের একটি শাখা উক্ত হাদিসদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ইমাম গাজ্জালী (ক.) বলেন, মানুষ যখন সৎলোকের সংশ্রবে থাকে তাকে মুহাব্বত করে তখন সে মন্দ লোকের দেখাদেখি পাপ কাজগুলো আর করতে পারেনা তার এমনিতেই লজ্জা এসে যায়। ওলী-বুজুর্গের সান্নিধ্য লাভ করলে লজ্জাগুণ অর্জিত হয়। (পৃ. ৯৫)

১৪. ভোজন বিলাসিতা সম্পর্কে: আমার উম্মতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যাকে নানা ধরণের নানা জাতের নিয়ামত সম্বলিত খাদ্য দান করা হয়েছে আর ঐ খাদ্য দ্বারা তার দেহ বৃদ্ধি হতে থাকে। তার শেষ ইচ্ছে শুধুমাত্র বিভিন্ন জাতের; বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য এবং পোষাক খাবার অথবা নিদ্রা ও উদরপূর্তি সবই অলসতার কারণ। (পৃ. ৫৭)

তাসাউফ সাহিত্যের অন্য এক কিতাব হযরত আল্লামা মুহাম্মদ হাসান মুজাদ্দেদী (রহ.) কর্তৃক বিরচিত 'তরীকুন্নজাত' বিধৃত বহু হাদীসের কয়েকটি এখানে চয়ন করা গেল।

১. অহংকার সম্পর্কে: রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন বেহেশতে ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করবেনা যার অন্তরে তিল পরিমাণ কিবির বা অহংকার থাকবে; আর দোযখে ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করবেনা যার অন্তরে একতিল পরিমাণ ঈমান থাকবে। (তারীকুননাজাত- পৃ. ১৩৩)

২. তুষ্ট থাকা: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) বলেন যে, ঐ ব্যক্তি যাকে সর্ব প্রথম কিয়ামতের দিন জান্নাতের মধ্যে আহ্বান করা হবে তিনি হবেন যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করতে থাকেন। এখানে দুঃখ-কষ্টের জীবনকেও মেনে নেয়ার শিক্ষা রয়েছে। (তরীকুন্নাজাত ১৭১ পৃ.)

৩. আহলে বাইতের ভালবাসা: রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন, আল্লাহর শপথ! কোন মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াস্তে আমার নিকটাত্মীয়ের জন্য আহলে বাইত (নবী পরিবার) এর প্রতি মুহাব্বত-ভালবাসা না রাখে। (পৃ. ৫৭)

৪. সদকা সম্পর্কে: সদকা আল্লাহর ক্রোধের আগুনকে শীতল করে, (পৃ. ১১৭)

৫. করুণা করা সম্পর্কে: তোমরা ভূমিতে বসবাসকারীর উপর দয়া করো তাহলে আকাশে অবস্থানকারী (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন। (১১৭)

৬. ক্রোধান্বিত হওয়া সম্পর্কে: হযরত ইবনে উমর বলেন, রাসূলে পাক ইরশাদ করেন, মান কাফ্ফা গাদ্বাবাহু ছাত্তারাল্লাহু আউরাতাহু, অর্থ, যে ব্যক্তি স্বীয় রাগ-ক্রোধকে সম্বরণ করে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তার নগ্নতাকে আবৃত করবেন। এর ব্যাখ্যায় সৈয়দ এর প্রসঙ্গ টেনে আল্লামা হাসান (রা.) বলেন, সৈয়দ হলেন তিনি যার উপর ক্রোধ জয়ী হয়না। যদি তুমি আল্লাহর নেককার বান্দা, ওলী আল্লাহ হতে চাও তাহলে নিজের গোস্বা ও রাগকে পান করে হজম করে নাও। (পৃ. ১২৬)

৭. সম্পদ ও আভিজাত্য সম্পর্কে: রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন ধন-সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মায়া মুহাব্বত মুনাফেকী বা কপটতাকে এভাবে উৎপন্ন করে যেভাবে পানি শস্যকে উৎপাদন করে, (পৃ. ১২৯)

৮. যৌনাঙ্গ সুরক্ষা প্রসঙ্গে: রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা এবং যৌনাঙ্গকে আমার উদ্দেশ্যে সুরক্ষার দায়িত্ব নেবে তার জন্য আমি বেহেশত দানের দায়িত্ব নিলাম। (পৃ. ১৩৪)

৯. মিথ্যা সম্পর্কে: মিথ্যা মুনাফেকীর দ্বারসমূহ হতে একটি দরজা (পৃ. ১৩৭)

১০. অপর হাদিসে রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন, মিথ্যা রিজিক বা উপজীবিকা হ্রাস করে দেয়। (পৃ. ১৩৭)

১১. হিংসা না করা প্রসঙ্গে: রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করোনা একে অপরকে বিদ্বেষ করোনা এবং মালপত্রের মূল্যমান বৃদ্ধি করে দিওনা, (অর্থাৎ ক্রয় করার ইচ্ছে নাই তবুও অন্য ব্যক্তি যেন তা খরিদ করতে না পারে সে জন্য দাম বাড়ানো।) কারো অগোচরে কোন পরচর্চা করো না, একে অপরের কুৎসা রটনা করোনা, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকো। (পৃ. ১৩৮)

১২. অভুক্ত থাকা প্রসঙ্গে: রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন নিজ আত্মার সাথে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা জিহাদ করো (আত্ম সংগ্রাম করা হলো জিহাদ) তার প্রতিদান হবে এমন যেমন আল্লাহর পথে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধকারীদের জন্য হয়ে থাকে। আর আল্লাহর নিকট ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা হতে অধিক পছন্দনীয় কোন আমল নেই। (পৃ. ১৪২)

১৩. অর্ধ ও পূর্ণ ইবাদত: হযরত হাসান (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা অর্ধেক ইবাদত আর স্বল্প ভোজন করা পূর্ণ ইবাদত। (পৃ. ১৪৩)

১৪. আহারান্তে দোয়া মুনাজাত: রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আহারকারী, ধৈর্যধারণকারী রোজাদারের সমান। (পৃ. ১৪৯)

১৫. ভীতি ও আশা সম্পর্কে: রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন হায়াতী খাইরুল্লাকুম ওয়া মামাতী খাইরুল্লাকুম, অর্থাৎ- আমার জীবনও তোমাদের জন্য উত্তম আর মৃত্যুও তোমাদের জন্য উত্তম, হায়াত উত্তম হলো যে, তোমাদের জন্য উন্নতি সফলতা ও কৃতকার্যতা লাভের উপায় এবং সুন্নাতগুলোকে নির্ধারণ করে দিই; তোমাদের জন্য শরীয়ত তৈরী করি। আর মৃত্যু হলে এটাই যে, তোমাদের আমল বা কৃতকর্ম সমূহ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সুতরাং তন্মধ্যে যেগুলো আমি সৎকর্ম ও ভাল দেখি তাতে আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে থাকি। আর যখন মন্দ কর্ম দৃষ্টি গোচর হয় তখন আমি তোমাদের মুক্তি ও ক্ষমা কামনা করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি।

উপসংহার: উপরে চল্লিশটি হাদিস সংকলন করা হয়েছে। যে গুলো তাসাউফ বা সূফীতাত্ত্বিক রচনাবলী হতে সংগৃহীত। বিষয় ভিত্তিক হওয়ার ফলে সর্ব সাধারণের জন্য এগুলো খুবই কল্যাণকর। এতদভিন্ন বিধানাবলীর চল্লিশটি হাদীস প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে প্রিয় নবী করিম (দ.) এর উৎসাহব্যঞ্জক হাদীস রয়েছে, আল্লাহ পাক আমার এ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে যথাযথ প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমিন! বিহুরমাতে নবিয়্যিল আমিন ও আউলিয়াইল মুকাররাবীন।

মর্যাদা ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে পরিশুদ্ধ অন্তর

• মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার •

মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব জীব নয়। আল্লাহ্ পাক মানুষকে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, সুন্দর-অসুন্দর অনুধাবনের জন্য ক্বাল্ব (অন্তর) দিয়েছেন। তাই মানুষ অন্তর দ্বারা চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-বিচেনার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকে। সুতরাং ক্বালব সর্বদা নিষ্কলুষ রাখা প্রয়োজন। কেননা অন্তর ভাল না থাকলে কাজ ভাল হয় না। অন্তরাত্মা সদা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখা ও অসুস্থতা থেকে নিরাপদ রাখা অতীব জরুরী। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الا وان فى الجسد مضغة : اذا صلحت صلح الجسد كله' واذا فسدت فسد الجسد كله' الا وهى القلب (صحيح بخارى: ٥٢)

'সাবধান, নিশ্চয় শরীরে এমন এক টুকরা গোশত আছে, যা সুস্থ থাকলে সারা শরীর সুস্থ থাকে এবং যা নষ্ট হলে সারা শরীর বিনষ্ট হয়। সাবধান, আর সেটা হল ক্বালব বা অন্তর'। (সহীহ্ বুখারী: ৫২)।

মানুষের অন্তরাত্মা ভাল থাকলে কাজ ভাল হয়, খারাপ হলে কাজে মনোযোগ থাকে না। তাই সর্বদা অন্তর পরিস্কার রাখা দরকার। পবিত্র ও পরিস্কার অন্তরে পাপ প্রবেশ করতে পারে না। শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা থেকে দিল পাক সাফ থাকে। অন্যথা অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তখন হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আর যখন হৃদয় ও মস্তিষ্কে দ্বন্দ্ব হয় তখন হৃদয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু বুদ্ধিমান থেকে হৃদয়বান হওয়া উত্তম। বুদ্ধিমান বুদ্ধি দিয়ে ভাল-মন্দ উভয়টা করতে পারে, আর হৃদয়বান কেবল ভালটা করে থাকে। মন্দ বা পাপকাজ তথা শয়তানী কর্মকাণ্ড অন্তর কলুষিত করে তখন আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা শুনলেও মন কাঁদে না, ভয়ভীতির উদ্রেক হয় না। তখন ইহলৌকিক জীবনে লাঞ্ছনা আর পারলৌকিক জীবনে মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (الشورى: ٨٨-٨٩)

'ক্বিয়ামত দিবসে অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কেবল সে-ই মুক্তি পাবে, যে সুস্থ ক্বাল্ব নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে'। (সূরাহ্ শু'আরা: ৮৮-৮৯)। সর্বদা অন্তর সুস্থ রাখার জন্য প্রত্যেকের সুদৃঢ় প্রয়াস থাকা দরকার। অসুস্থ অন্তরে সালাত আদায় করলে তাতে আল্লাহ্ভীতি থাকে না। সালাতে সুন্নাত ও নফল আদায়ের পরিমাণ কমে যায়। কল্যাণকর কাজে আগ্রহ হ্রাস পায়। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا (النسآء: ١٤٢)

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করে, বস্তুত এজন্য তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে'। (সূরাহ্ নিসা: ১৪২)।

وَلَا يَاْتُوْنَ الصلوة الاوهم كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (التوبة: ٥٤)

'তারা সালাতে আসে অলসতার সাথে, আর অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় করে'। (সূরাহ্ তাওবাহ্ : ৫৪)। অন্তর ভাল ও সুস্থ থাকলে পার্থিব লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, মায়া-মমতা, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা ও অহংবোধ থাকে না। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আনুগত্য ও ইসলামের বিধি-নিষেধের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

অন্তরাত্মা সুস্থ রাখতে আল্লাহর নির্দেশপরিপন্থী কামনা-বাসনা পরিহার করতে হবে। ইবাদত-বন্দেগী ও ভাল কাজে অলসতা বর্জন করতে হবে। মন কুপ্রবৃত্তি মুক্ত রাখতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (النحل: ٩٧)

'পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সৎকর্ম করে সে মুমিন, আমি নিশ্চয় তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের জন্য পুরস্কার দেব'। (সূরাহ্ নাহ্ল: ৯৭)। আখিরাত থেকে দুনিয়ার ভালবাসা প্রাধান্য পেলে অন্তর ক্রমশ অসুস্থ হতে থাকবে। দুনিয়ার স্বার্থে বিভোর হতে থাকবে। কুপ্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ততা আকৃষ্ট করবে। অসৎ সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকবে। ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্য ভাবার পার্থক্যজ্ঞান হ্রাস পাবে। ক্বাল্ব বা অন্তর সুস্থ রাখতে না পারলে ভাল

অর্জনগুলো আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকবে। মনের পবিত্রতা ক্ষীণ হয়ে আসবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال ان العبد اذا اخطا خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذى ذكر الله ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ (سنن الترمذى: ٣٣٤)

'হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (দ.) ইরশাদ করেন, বান্দাহ্ যখন একটি গুনাহ্ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়, যখন খাঁটি মনে তাওবা-ইস্তিগ্‌ফার করে তা মুছে যায়। একই পাপ যখন সে পুনরায় করে তখন সে কালো দাগ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, এক পর্যায়ে তা বিস্তৃত হয়ে পুরো অন্তর ছেয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক বলেন, কখনো নয় বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে'। (সুনান তিরমিযী)। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف : ١٧٩)

'আর আমি বহু জিন ও ইনসান জাহান্নামের জন্য পয়দা করেছি। তাদের ক্বাল্‌ব আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা অনুধাবন করে না, আর তাদের চোখ আছে, তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কান আছে, তা দিয়ে শুনে না, তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের ন্যায়, বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হল গাফিল'। (সূরাহ্ আরাফ: ১৭৯)।

দৃষ্টান্তের জন্য আল্লাহ পাক যাদের গোমরাহ্ করেছেন শত আদেশ-উপদেশেও তারা কল্যাণের দিকে আসে না, সালাতের দিকে আসে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرة: ٧)

'আল্লাহ পাক তাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তির উপর মোহর করে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি অবধারিত'। (সূরাহ্ বাক্বারাহ্: ৭)।

আল্লাহ পাক যাদের কবূল করেছেন, তাদের সর্বদা সতর্ক থাকা চাই। শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসায় যাদের নেক আমল বরবাদ হয়েছে বা হচ্ছে, তাদের উচিৎ নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা, যিক্‌র করা, হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, নেক আমল করা, সৎ ও পরহেয্‌গারদের সাথে সম্পর্ক রাখা, ক্বাল্‌বকে পরকালীন মুক্তির চেতনায় উজ্জীবিত করা, পরকাল ও পরকালীন আযাব সম্পর্কে বেশী বেশী চিন্তা-ভাবনা করা। সর্বোপরি হাক্কানী-রাব্বানী মুর্শিদের সুহ্‌বাত লাভ করা।

ইসলাম স্বভাব-প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বিবেকের ধর্ম। আল্লাহ্ পাক মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে আশরাফুল মাখলুক-এর মর্যাদা দিয়েছেন। তাই অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও ভাল কাজের স্বীকৃতি মানুষের স্বভাবজাত। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যে কাজকে স্বীকৃতি দেয় ইসলাম তা অনুমোদন করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের চেনা জানা ও পরিচিত জিনিসকে হালাল করেছেন। আবার সব কাজ বা সবার বিবেক-বুদ্ধি সমান না। তাই কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক কোন কাজ যদি আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্‌পরিপন্থী হয়, তা মানা যাবে না।

সৃষ্টির সেরা মানুষের মধ্যে আবার মুসলমানরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (ال عمران : ١١٠)

'তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করবে। কিতাবীরা যদি ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য ভাল হত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে, তবে তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।' (সূরাহ্ আল-ই ইমরান: ১১০)।

তাই মুসলমানদের পার্থিব বিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞান অর্জন, চরিত্র গঠন ও অন্তরাত্মা পুত-পবিত্র করে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা সমুন্নত রেখে দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রাখতে হবে। নানা কারণ ও প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা আজ আদেশ দানের পর্যায়ে নেই, তারা কাফির-মুশরিকদের আদেশানুগত। এ অবস্থায় মুসলমানদের মর্যাদা ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে আক্বীদাহ্ ও মাযহাবের স্ব স্ব অবস্থান থেকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে।

সাধনে কায়দা জানা চাই, বেকায়দায় করলে সাধন মাওলা রাজি নাই

সবর ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রসঙ্গ

• মাওলানা কাজী মোহাম্মদ হাবিবুল হোসাইন •

পূর্ব প্রকাশের পর:

সবর শব্দের অর্থ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা বিরত রাখা। ইসলামী পরিভাষায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সকল কর্তব্য পালন করা। কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় সবরের তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে।

(এক) নিজের নফসকে হারাম এবং নাজায়িয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা, (দুই) ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ যে সব বিপদ আপদ উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবর এর পরিপন্থী নয়। আসলে সবর মানব জীবনের একটি মহৎগুণ। এটি মানব জীবনের সফলতার চাবিকাঠি। ধৈর্যের অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য লাভ করা যায় না। ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন, তথাপি নিজের ও সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য তা করা অপরিহার্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

অর্থাৎ, হে ঈমানদারা! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সামর্থবান হতে পার। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২০০)। ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ পাক বলেন, انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب অর্থাৎ, সবরকারী বান্দাদের বিনা হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। (সূরা আয যুমার আয়াত ১০)।

হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, সবরকারীরা কোথায়? একথা শোনার সাথে সাথে সে সব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারে সবর করে জীবন অতিবাহিত করেন। এসব লোককে প্রথমে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসির)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

يايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلوة অর্থাৎ: হে ঈমানদারা, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। (সূরা বাক্বারা- ১৫৪)। এ আয়াতে বলা হয়েছে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি সবর, অন্যটি সালাত।

প্রিয় নবীজী (দ.) আনসারদের একদলকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ঈমানদার? সে দলের লোকেরা বললেন, হ্যাঁ আমরা ঈমানদার। প্রিয় নবীজী (দ.) জিজ্ঞেস করলেন তোমরা যে মুমিন, এর নিদর্শন কী? তারা আরয করল, 'আমরা নিয়ামত পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, দুঃখ-কষ্টে সবর করি এবং আল্লাহর বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকি।' হযরত নবী করীম (দ.) বললেন, 'আল্লাহর শপথ তোমরা পরিপক্ক মুসলমান'।

মানব জীবনে অনেক ধরণের বিপদাপদ আসবে তখন ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এগুলো মুমিনের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ পাক বলেন,

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين.

অর্থাৎ, এবং আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ সবরকারীদের জন্য। (সূরা বাক্বারাহ -১৫৫)

বস্তুতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর যে বিপদাপদ পতিত হয় সেগুলো ধৈর্যের পরীক্ষা মাত্র। এ সময় ধৈর্য ধারণ করতে হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, আমি ধৈর্যশীলদের সাথে আছি। (সূরা বাক্বারা-১৫৪) ইঞ্জিল কিতাবে আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, 'যে সকল নবী আমার পূর্বে আগমন করেছিলেন তারা বলেছেন, 'হাতের পরিবর্তে হাত কেটে দাও, চোখের বদলে চোখ নষ্ট করে দাও, দাঁতের বদলে দাঁত ভেঙ্গে দাও, আমি তাদের এই বিধান রহিত করছি না, কিন্তু আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, অনিষ্টের বদলে অনিষ্ট করোনা, বরং কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে তুমি তার নিকট বাম গাল ফিরিয়ে দিয়ে বল ভাই এই গালেও একটি চড় মার। কেউ তোমার পাগড়ি কেড়ে নিলে তোমার জামাটিও তাকে দিয়ে দাও, কেউ তোমাকে বিনা পারিশ্রমিকে এক মাইল নিয়ে গেলে তুমি তার সাথে দু মাইল চলে যাও।'

প্রিয় নবীজী (দ.) বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর, যে তোমার অনিষ্ট করে তুমি তার মঙ্গল কর। অর্থাৎ ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা কর।

সবরের অন্যতম দিক হল আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে সবর করা। আল্লাহ পাক মুমিনদের নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে সবরের

সাথে ইবাদত করে। মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল (দ.) এবং তাঁদের যোগ্য প্রতিনিধিদের আনুগত্য করাও আবশ্যক। কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম'।

প্রিয় পাঠক! মানুষের জীবনে আসে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, সফলতা-বিফলতা ও জয়-পরাজয়। এসব ক্ষেত্রে সবরের প্রয়োজন। মুসিবতে যেমন সুদিনের আশায় সবর করতে হয়, তেমনি সুদিনে আত্মহারা না হয়ে শোকর করতে হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আমরা মুমিন কিংবা আশিক-ভক্ত দাবী করি কিন্তু আমরা সবর করতে রাজি না। মসজিদে গেলে শৃঙ্খলার সাথে বসতে আগ্রহী নই বা ইমাম সাহেবের খুতবা, কথা ভাল লাগে না, তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিংবা দরবার এ পাকে বা উরস মাহফিলে গেলে কার আগে কে যাবে, হাদিয়া নিয়ে দরবারে প্রবেশ করার সময় মানুষকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দিয়ে হাদিয়া-নজরানা নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ আদবের পরিপন্থী। সরেজমিনে দেখা যায়, বিভিন্ন দরবারের উরস মাহফিল অনুষ্ঠানে ভক্তের আনাগোনা একটু বেশি হয়। কিন্তু উরস শরীফ অনুষ্ঠানে যেভাবে মানুষ হুড়োহুড়ি করে এতে অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হয়। তাবাররুক গ্রহণে-বিতরণে মাযার শরীফ যিয়ারতে অন্য যায়েরীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য যেভাবে ধৈর্যহারা হয়, এতে সওয়াবের চেয়ে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সবাইকে উদার মন নিয়ে দরবারে আসা উচিত। কারণ মনে রাখতে হবে আমি যে রকম অন্যজনও একই রকম। বরঞ্চ বয়স ভেদে অন্য ভক্ত যায়েরীনের সহযোগিতা করা বাঞ্ছনীয়। আর উরস শরীফ, মাহফিল ইত্যাদিকে ভ্রাতৃত্ব সম্মেলন মনে করতে হবে। এখানে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করা ভক্তের চরিত্র হওয়া উচিত। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা-আন্তরিকতার সম্পর্ক হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব।

ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব ছাড়াও আরো দু'প্রকারের ভ্রাতৃত্ব রয়েছে, একটা বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আরেকটা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। আল্লাহ বলেন,

يايهاالناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنا كم شعوبا وّقبائل لتعارفوا.

অর্থাৎ, হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (সূরা হুজুরাত- ১৩)

পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হাওয়া (আ.)। তাই বিশ্বের সকল মানুষ ভাই ভাই। আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি এবং বর্ণ-ভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। আর এভাবে মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবুও সবাই ভাই ভাই। একই পরিবারের সদস্য। রাসূল (দ.) বলেন, الخلق عيال الله সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। একই পরিবারের সদস্য। তদ্রুপ দরবারের সকল আশিক-ভক্তকে ভাই ভাই জানতে হবে। কোন অবস্থাতে কারো প্রতি যাতে অশ্রদ্ধা ফুটে না উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সবার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা দরবারের আশেকানের বৈশিষ্ট্য হওয়া কাম্য। এজন্য শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারীও ইরশাদ করেছেন, আমার দরবার সকল জাতির মিলন কেন্দ্র। কিংবা আল্লাহর অলির দরবারে আমির-ফকিরের তফাৎ নেই।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, ইসলামে উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল বলেন,

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

মুসল্লি যখন মসজিদের জামাতে দাঁড়ায়, সবাই একই কাতারে কাতার বন্দি হয়, বাদশা আর চাকরের কোন তফাৎ থাকে না।

আল্লাহ ও তার রাসূল (দ.) এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই। রাসূল (দ.) বলেন, অনারবদের উপর যেমন আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমন আরবদের উপর অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

মাহবুবে খোদা (দ.) পৃথিবীর সকল ঈমানদারকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন। দেহের কোন একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে যেমন পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে এক মুমিন-মুসলমান বিপদে পতিত হলে সকল মুসলমানের অন্তর ব্যথিত হয়। কোন অবস্থাতে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। যদি কারো সাথে কোনো বিবাদ সৃষ্টি হয় সাথে সাথে অন্য ভাই এটা মিটিয়ে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ বলেন,

انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقو الله الخ

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু' ভাইয়ের মধ্যে (কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে) মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১০)

প্রিয় নবীজী (দ.) ইরশাদ করেন, কোন মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর মুসলমানের জন্যও যেন তা পছন্দ করে, অন্যথায় সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু আমরা যা জানি, তা মানিনা। অন্যথায় উরস কিংবা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা হয় কেন? আমরা যদি ত্বরিকত পন্থী হই কিংবা মুর্শিদ এর নসিহত শ্রবণ করে থাকি, তাহলে আমাদের উচিত, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা মেনে চলা । তাহলেই কোনো অলি দরবেশের দরবারে বা কোনো উরস অনুষ্ঠানে যাওয়া আমাদের সার্থক হবে। (চলবে)

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

শাহানশাহ্ জীবনী শরিফের পাঠ এবং জামাল আহমদ সিকদার

• বদরুন্নেসা সাজু •

[মরহুম জামাল আহমদ সিকদার ছিলেন মাইজভাণ্ডার শরীফের একনিষ্ঠ খাদেম ও অনুসারী। তিনি ছিলেন মাসিক আলোকধারার প্রথম সম্পাদক। শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর জীবনী শরীফ রচনা তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। আগামী ১৫ এপ্রিল তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মাগফিরাত কামনা করছি। –ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক]

এনায়েতপুরের সাবেক চেয়ারম্যান (মামা মরহুম) আবুল কাশেম চৌধুরী একবার উরসের সময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গেলেন। সেখানে মামাকে জীবনী বই- "শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)' এবং প্রথম সংখ্যা আলোকধারা (পত্রিকা) দেওয়া হল। তখন আমরা জানলাম সেগুলো প্রকাশ হওয়ার কথা। মামার ঘর থেকে আমাদের ঘরে এনে বড় ভাই এম.এ. কাদের (আলম), ছোট বোন জেবুন্নেসা শিরীন ও আমি ওগুলো পড়ে শেষ করি। ওই সময় থেকে শাহানশাহ্ (রহ.)এর জীবনী রচয়িতা ও আলোকধারা এর (নির্বাহী) সম্পাদক হিসেবে জামাল আহমদ সিকদারের নাম জেনেছি। তখন সম্ভবত ১৯৮৫ সাল। শুনেছি জীবনী এবং আলোকধারা পড়ে আরও বেশী মানুষের আনাগোনা বা যাতায়াত বেড়ে যায় মাইজভাণ্ডার শরিফে। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মাহাত্ম্যের বহুমুখি কল্যাণকর প্রভাব আলোক শিখার মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কল্যাণ প্রত্যাশী বহু মানুষ ঐ আলোক কেন্দ্রের দিকে ছুটতে থাকে।

পঁচিশ বছর ধরে যোগাযোগ তথ্য সংগ্রহ মতবিনিময় অনুশীলন ও দীর্ঘ চিন্তা চেতনার ফসল জনাব জামাল আহমদ সিকদার রচিত জীবনী গ্রন্থ 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'। তিনি এ বইয়ের পরিপূর্ণ রূপ বা পূর্ণাঙ্গ কলেবর সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি তাঁর লেখার একাগ্র ধ্যান ধারণা, পরিশ্রম-সাধনা ও গভীর নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। বইয়ের লেখক হিসেবে তিনি নিজের ব্যক্তিগত কোন প্রকার পরিচয় রাখেন নি। অর্থাৎ ঐ কাজে আত্মবিলীন বা নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছেন মুনিব-মুর্শিদ মাইজভাণ্ডারীর দুয়ারে। এ সমর্পণ নিঃস্বার্থ সমর্পণ যেখানে ইহজগত ও পরজগতের জন্য মহাশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

ভক্তি ও সন্দেহমুক্ত মন নিয়ে

যখন প্রথম সংস্করণ 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)' প্রকাশিত হয়, তখনই ভূমিকায় জামাল আহমদ সিকদার লিখেছেন: 'প্রগাঢ় ভক্তি ও সন্দেমুক্ত মন নিয়ে এ বই পাঠ করুন। হয়তে কোন সৌভাগ্যের দুয়ার খুলতে পারে'। বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে সেরূপ আকর্ষণীয় একটি ঘটনার বিবরণ রয়েছে। সেটি যেমন ভক্তিপূর্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকার। এটি পাঠ করে যে কোন পাঠক অভিভূত হবেন। একজন মাত্র এরূপ একটি ঘটনা অকপটে প্রকাশ করেছেন। জীবনী শরিফে তা 'ভাগ্যের দুয়ার খুলতে পারে'-এ শিরোনামে বর্ণিত আছে। বিশ্বাস ভক্তি ও খোদায়ী প্রেম মহব্বতের মহিমা ও লীলাখেলা কত যে বিচিত্র হতে পারে তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। মহান সৃষ্টিকর্তা অলি আওলিয়ার নৈকট্যের মাধ্যমে তাঁকে চেনার পথ বা রাস্তা খুলে দিলেন। আল্লাহ্‌র পেয়ারা মহান রাসূলের (দ.) অনুগতরা প্রকৃত অলি আওলিয়ার শান মান বুঝতে পেরে ভক্ত অনুরক্ত অনুসারী আশিক হয়ে যায়। ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যথার্থ ভক্তিময়তায় জীবনী শরিফ পড়ে আরও অসংখ্য মানুষ নানাভাবে উপকার পেয়েছে, প্রত্যেকের নিজের সমস্যা, আর্জি ও নিয়ত অনুযায়ী আশা পূরণ হয়েছে। কিন্তু সেগুলো মানুষ অর্থাৎ উপকারপ্রাপ্তরা প্রকাশ করেনি। অনেকে নিজের মধ্যে রেখে দিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা এবং নিয়ত-মানত করে যাচ্ছে। কেউ কেউ আরও সমস্যা সমাধানে বা প্রতিকারের আশায় প্রতিনিয়ত দরবারে ধর্ণা দেয় এবং উপকার পেয়ে ধন্য হয়, কৃতজ্ঞ থাকে। এভাবে উপকার লাভ এবং আশা পূরণের ক্রমধারা মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অনেকে পরিবার আত্মীয় স্বজন কিংবা

বন্ধু বান্ধবের সাথে কিছু কিছু হয়তো বলাবলি করে বা প্রকাশ করে। কিন্তু এর বাইরে তেমন প্রকাশ করে না। কোন কোন মানুষ এমনও আছে যারা নিজের মধ্যে এসব পবিত্র আমানতের মতো গোপন রাখে।

২৫ বছরের সাধনা:

জামাল আহমদ সিকদার বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ জিয়া বাবাজানকে জেনেছেন বুঝেছেন চিনেছেন এবং প্রার্থীত করুণাধারা অর্জন করে ধন্য হয়েছেন। তাই 'প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী অলি'-এর মধ্যে লিখতে সক্ষম হয়েছেন- আল্লাহ্‌র দু'টি শ্রেষ্ঠ গুণ সৃষ্টি পূর্বের মগ্নচৈতন্য (মগলুবুল হাল) স্বভাব এবং সৃষ্টি শুরুর প্রচণ্ড জজবা (দীপ্ততা) এই মহান অলিআল্লাহ্‌র চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল; যেহেতু অলিরা 'আয়নায়ে বারী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে দেখার আয়না বিশেষ। ...

জীবনকালে লক্ষ লক্ষ লোক শাহানশাহের এই দুর্লভ চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ্‌র গুণধর অলিদের দেখাও এক মহাসৌভাগ্য - ইবাদত। হাদিসের উল্লেখ- পূণ্যবানদের স্মরণকালে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়।

শাহানশাহের কাছ থেকে জামাল দাদা জ্ঞান সঞ্চয় এবং বিকাশের করুণা বা কৃপা লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী উল্লেখ করে স্বয়ং শাহানশাহ তাঁকে বলেছেন- আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।

শাহানশাহের জীবনী শরিফের লেখক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এ বইটি রচনায় লেখক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেখানে ঐতিহাসিক ঘটনা ও আধ্যাত্মিক পটভূমি, নৈতিক, দার্শনিক সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পরিক্রমায় মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সকল ধাপ উপস্থাপনার ধারাবাহিকতাসহ বহু বিষয় লক্ষ্য করা যায়। একই সাথে এই গ্রন্থে বাস্তবতাবোধের সাথে মিল রেখে লেখকের ভাষার কাব্যময়তা, প্রকৃতির রূপের বর্ণনা এবং বিখ্যাত গান-কবিতার চয়নিকার সাথে শাহানশাহের কারামতের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। তাই আধ্যাত্মিকতার পূর্বাপর সমন্বয়ে এবং আধুনিকতার সাহিত্যগুণে উপমা যোগ ও ভাষা প্রয়োগে এ গ্রন্থ সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক পর্যালোচনায় জনাব জামাল সিকদারের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)' প্রকাশ পাওয়ার পরও লেখার সাধনায় নিবেদিত হয়ে দীর্ঘ ২৫ (পঁচিশ) বছর ধরে আরও তথ্য উপাত্ত সংযোজন করে লেখক এ গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। এটি লেখকের চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা! এবং পাঠকের বিস্ময়!!

চিঠির মাধ্যমে:

প্রথম সংখ্যা আলোকধারা পত্রিকা এবং জীবনী শরিফ আমার পড়া শেষ হলে বিশ্বঅলি শাহানশাহের সাথে সাক্ষাতের জন্য মনে আমার সুপ্ত আশা জাগে। তাই শাহানশাহ্ বাবা কোথায় থাকেন এবং আলোকধারা প্রকাশনার মতামত জানিয়ে (আলোকধারার জন্য একটি মাইজভাণ্ডারী কবিতাসহ) জামাল দাদার কাছে একটি চিঠি লিখে পোস্ট করি। সেই চিঠির জবাবে তিনি একটা চিঠি পোস্টে পাঠালেন। ১৪/৭/১৯৮৫ ইং এ লেখা এ চিঠিতে কল্যাণীয়াসু সম্বোধন করে তিনি আরও জানালেন, 'BTV এর একতারা অনুষ্ঠানে ২৩/৭/৮৫ইং, ৬-১৫ মি.) মাইজভাণ্ডারী গান ও জিকির দেখুন। আমরা অংশ নিয়েছি'। চিঠির অংশবিশেষঃ- (শাহানশাহ্ বাবাজী বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরে দামপাড়া বেটারী গলিতে আবদুল গনি সওদাগরের ঘরে আছেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরে পাঠানটুলী আকমল খানের বাসা, বিশ্বরোড নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিণে মর্তুজা সাহেবের ইফকো হাউস, বাটালী পাহাড়ের একটু নীচে (আমবাগান) রাস্তার পশ্চিম পাশে জহুর সাহেবের বাসায়, আন্দরকিল্লাহ্ রাজাপুকুর লেনে বজল কোম্পানির বাসায়, উনার দুই ভগ্নিপতি নজির আহামদ চৌধুরী সড়কে কামাল সাহেবের বাসা ও পশ্চিম মাদারবাড়ী রশিদ মাস্টারের ছেলের বাসাসহ আরও অনেকখানে মাঝে মধ্যে থাকেন। ঢাকার শফিউল আজম সাহেবের ছোট ভাই সাহেদুল আজমের বাসায় (১০/৫ ইকবাল রোড, মুহম্মদপুর) এবং হাটখোলা রোডে চট্টগ্রাম মাস্টার সার্ভিসেস এর মালিক মীর আহমদ সাহেবের বাসায় থাকেন। আশা করি, আপনার জানার আগ্রহ মিটবে। - শুভেচ্ছান্তে - জামাল আহমদ সিকদার, নির্বাহী সম্পাদক।

এই চিঠির সুত্র ধরে একদিন দামপাড়া বেটারী গলি আস্তানায়/খানকাহ্ গেলাম। কিন্তু শাহানশাহের দেখা পাইনি। একবার মাইজভাণ্ডার শরিফে শাহানশাহ্ অবশ্যই নিজ মহাগুণে দেখা দিলেন এবং (এ অধমকে) সম্মান দেখালেন। আবার আপ্যায়নও করালেন স্বয়ং শাহানশাহ্ জিয়াউল হক

মাইজভাণ্ডারী! তখনই আলোকধারায় তিনি আমাকে লেখা পাঠাতে বলেছিলেন। তাঁর এই সান্নিধ্য ছিল - আমার জীবনের বিরল সৌভাগ্যের উজ্জ্বল একটি দিন। হৃদয়ের মণিকোঠায় সেদিনের স্মৃতি অক্ষয় অমলিন হয়ে আছে।

আমার কাছে লেখা এবং পোস্টে পাওয়া জামাল দাদার আরও কয়েকটি চিঠি ছিল কিন্তু সেগুলো খুঁজে পাচ্ছি না বলে আমি মর্মাহত। সেগুলোতেও অনেক অমূল্য কথার জ্ঞান সম্পদ রয়েছে। তাঁর আরেকটি চিঠির সূত্র ধরে শাহানশাহের ফয়েজপ্রাপ্ত (ঐশী অনুগ্রহ) মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মানসপুত্র কুতুবুল ইরশাদ সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের সাথে আমার সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ঘটেছিল। জামাল দাদা চিঠিতে লিখেছিলেন শাহ্ সাহেব সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের নিকট থেকে মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা ও দর্শন সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসার জওয়াব মিলবে এবং জ্ঞান পিপাসা মিটবে। এটাও জীবনের মহামূল্যবান সঞ্চয়ের আরেক জ্যোতির্ময় দিক, দ্যুতিময় বিকাশের দিকে গতিময় মহড়া। অবশ্য আমার মায়েরও একান্ত প্রার্থনা ছিল, আমি যেন মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দিকে অলি আওলিয়ার সুফিবাদের দিকে ভক্তিসহ অনুগামী হই।

কল্যাণমুখী দরবারী কার্যক্রমে:

প্রথম থেকে শাহ্ সাহেব হযরত সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের সাথে জামাল দাদার একান্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁরা দু'জন সমন্বিতভাবে যুক্ত থেকে কমিটির সদস্য এবং আরও দায়িত্বশীল লোকজন নিয়োগ করে দরবারী কাজগুলো সম্পাদন করেছেন। কোন কাজ করার আগে শাহ্ সাহেব তাঁর প্রিয় শাহানশাহ্ বাবাজান থেকে অনুমতি নিতেন। সেই সময় সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার সাহেব সভাপতি এবং জামাল দাদা এন্তেজামিয়া কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

মাইজভাণ্ডার দরবারের পক্ষ থেকে ত্বরিকা ও দর্শনের কল্যাণমুখী প্রচার কাজে বিভিন্ন মাহফিল ও অনুষ্ঠানে জামাল আহমদ সিকদার যোগদান করে বক্তব্য দিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দূর দুরান্তে এমন কী প্রত্যন্ত অঞ্চলেও গমণ করতেন। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এবং অন্যান্য আরও বহুমুখী দরবারী কার্যক্রমের সাথে তিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি রাজনীতিক ছিলেন। সমাজসেবায় তাঁর অবদান স্মরণীয়, তেমনি সুবক্তা হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সংগঠক ছিলেন।

জামালদা'র আগ্রাবাদে মটর পার্টস এর ব্যবসা ও অফিস ছিল। সেখানে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি উদার-হৃদয় জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। কথোপকথনের সময় দেখতাম, কতো উঁচুস্তরের চিন্তাভাবনা এবং বিরাট মাপের মহৎ কথা, তিনি বলতেন! আমি অবাক হতাম। কিছু কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা আমার বুঝতে অসুবিধা হতো। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মানবতার সর্বোচ্চ স্তর এবং বিশ্ব জ্ঞানের বিষয়গুলো অসাধারণ মেধাশক্তিতে তিনি অনর্গল বলতে পারতেন। অন্যদিকে আমার গ্রহণ ক্ষমতা ও ধারণক্ষমতা সেরূপ ছিল না বলে আমি এরূপ উচ্চস্তরের জ্ঞানবার্তার সবকিছু ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারতাম না। তখন নিজের অজ্ঞান অবস্থা বা অজ্ঞতা উপলব্ধি করে আমার সংকোচবোধ হতো।

জামাল আহমদ সিকদারের যেরূপ কথা সেরূপ কাজ, সেরূপ লেখাও। তাঁর লেখার জ্ঞান গভীরতা ব্যাপক। বিজ্ঞান বিষয়ক অনুসন্ধানী তথ্যে ভরপুর বাক্যের বিন্যাসে অপরূপ জামাল দাদার গবেষণাসমৃদ্ধ লেখাগুলো মানুষের ভাবনার দিগন্ত খুলে দেয়। আবার চিন্তাভাবনার আকাশে বিচরণ করার অবারিত অবকাশ এবং সুযোগও সৃষ্টি করে দেয়। তিনি বহুমুখী মানব কল্যাণকর কাজ যেমন করতেন, একইরূপে অন্যদের দিক নির্দেশনা দিতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। এইভাবে দরবারী কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন হতো। শাহানশাহ্ এবং শাহ্ সাহেবের পবিত্র অন্তর্ধান/বেছালের পর মাওলা হুজুর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানের (ম.) ছত্রছায়ায় ছিলেন বলে জামাল আহমদ সিকদারের জীবন শান্তিপূর্ণ এবং সার্থক হয়ে ওঠেছিল। তিনি আমাকে লেখালেখি করার জন্য উৎসাহ দিতেন। মাইজভাণ্ডার শরিফের সাথে সংশ্লিষ্ট একাত্ম (বক্তপুর ভাণ্ডারের) সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের (র.) সাহচর্য এবং জামাল দাদার লেখনীর মাধ্যমে ও অলি আওলিয়ার ভক্তি দ্বারা আমরা আল্লাহ্-রাসূলের (সা.) আনুগত্য প্রেম ভালোবাসা উপলব্ধি করতে বা বুঝতে শিখেছি।

বায়াত গ্রহণে নবী করীম (দ.) এর উত্তরাধিকারীর শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য

• মাওলানা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আযহারী •

পূর্ণতার শীর্ষে আরোহনের জন্য নবী করীম (দ.) এর উত্তরাধিকারীদের সান্নিধ্য অবলম্বনের মাধ্যমে শিষ্টাচার ও মহত্বের দীক্ষা নেওয়া, আত্মার সূক্ষ্ম ব্যাধি ও দোষ ত্রুটিগুলো নিরূপন করার গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁদেরকে কিভাবে পাওয়া যাবে? তাঁদের পরিচয় কিভাবে জানা যাবে? তাঁদের বৈশিষ্ট্য কী? তাঁদের সান্নিধ্যে গিয়ে উপকৃত হওয়ার শর্ত কী কী? উত্তর, প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করবে অর্থাৎ মুরিদ যখন কামিল পীরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, যেমন ব্যাধিগ্রস্ত লোক ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তখন সে সুদৃঢ় সংকল্প, বিশুদ্ধ নিয়ত, বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে গভীর রাত্রে একান্তে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে যেন এ ফরিয়াদ করে যে 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন মুর্শিদের সন্ধান দাও, যিনি তোমার পথ প্রদর্শন করেন এবং এমন ব্যক্তির সান্নিধ্য দাও, যিনি আমাকে তোমার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবেন'।

দ্বিতীয়তঃ তার (আল্লাহ অভিমুখে যাত্রীর) উপর আবশ্যক, সে যেন প্রথমে নিজ শহরে নবী করীম (দ.) এর উত্তরাধিকারী তথা কামিল মুর্শিদের অনুসন্ধান করে এবং তার এই মুর্শিদের সন্ধানে অভিযান যেন অতীব হুশিয়ারী ও আন্তরিকতার সাথে হয়, ঐ সমস্ত লোকের অপপ্রচারে যেন বিভ্রান্ত না হয়, যারা বলে বেড়ায় যে এ যুগে কামিল মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক মুরুব্বী পাওয়া অসম্ভব। এ ধরনের কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ প্রত্যেক যুগেই রাসূলাল্লাহ (দ.) এর উত্তরাধিকারী তথা আওলিয়ায়ে কিরাম বিদ্যমান থাকেন, তাঁরা ছদ্মবেশে তাঁদের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত, পরিচয় গোপন রাখেন। তাঁদের খুঁজে বের করতে হয়।

আর যদি নিজ শহরে কামিল পীরের সন্ধান না মিলে, অন্য শহরে ভিন্ন দেশে গিয়ে তাঁদের খুঁজতে হবে। কারণ এটাতো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগী যখন নিজ দেশে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না পায় তখন নিরুপায় হয়ে সঠিক চিকিৎসার জন্য অন্য দেশে সফর করে বিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, দেহের চিকিৎসকের জন্য যদি এত কষ্ট করতে হয়, অনুসন্ধান চালাতে হয়, তাহলে আত্মার চিকিৎসকের জন্য কী করতে হবে তা সহজে অনুমেয়। কারণ, আত্মার সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের পূর্বশর্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'সেদিন কারো ধন সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি সফল হবে যে পরিচ্ছন্ন আত্মা নিয়ে আসবে।' (সূরা শু'আরা ৮৮-৮৯)

নবীয়ে করীম (দ.) বলেছেন, 'জেনে রাখ মানব দেহে একটি মাংস পিন্ড রয়েছে, যা ভাল থাকলে পুরো শরীর ভাল থাকবে আর তা নষ্ট হলে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। আর জেনে রাখ মাংস পিন্ড হচ্ছে মানবের 'ক্বালব' বা আত্মা। আর নবীয়ে করীম (দ.) এর উত্তরাধিকারী আওলাদে রাসূল (দ.) তথা আওলিয়ায়ে কিরাম হচ্ছেন আত্মার চিকিৎসক। তাই তাঁদের খুঁজে বের করতে, তাঁদের সান্নিধ্য পেতে দেহের চিকিৎসক খোঁজার চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

মুরিদ এমন মুর্শিদ তালাশ করবেন, যিনি মুরিদকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের পথ প্রদর্শনে যোগ্যতা রাখেন, আর তাঁর মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি শর্ত পাওয়া আবশ্যক।

১. ফরযে আইন সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। (ফরযে আইন মানে যে সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বান্দার উপর অর্পিত, আর তা অবশ্যই পালনীয়)।

২. আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

৩. আত্মশুদ্ধির পন্থা ও ক্বালব নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় পন্থা পদ্ধতির সম্যক ধারণা ও সুক্ষ্ম জ্ঞান থাকতে হবে।

৪. মানুষকে দীক্ষা দেয়ার জন্য উর্ধ্বতন পীর-মুর্শিদ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে।

পীর-মুর্শিদ হওয়ার জন্য যে চারটি শর্ত আবশ্যক, নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল,

প্রথম শর্ত: পীর-মুর্শিদ যিনি হবেন তাঁর ফরযে আইন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত-

এর মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি তথা মাসয়ালা-মাসায়েলসমূহ জানা থাকতে হবে। তিনি যদি ব্যবসায়ী হন, তাহলে ইসলামী শরীয়তের আলোকে ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেন এর যাবতীয় নিয়ম-কানুন জানা থাকা আবশ্যক। ইসলামের মূলধারা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'-এর আক্বায়িদ তথা মূলনীতিসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ধারণা থাকতে হবে। যেমন 'তাওহীদ' আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। অতএব আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তার জন্য কোনটা প্রযোজ্য, আর কোনটা প্রযোজ্য নয়, কোনটা সম্ভব আর কোন্টা সম্ভব নয়, এভাবে নবী-রাসূলের ব্যাপারেও বিশদ ধারণা থাকতে হবে। অনুরূপ ঈমানের অঙ্গসমূহের বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: পীর-মুর্শিদ 'আকায়িদে আহলে সুন্নাতের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ভালভাবে আয়ত্ব করে সেগুলোর উপর অটল থাকতে হবে, সে অনুযায়ী আমলে সাচ্ছন্দ্যবোধ করতে হবে। আহলে সুন্নাতের 'আক্বীদা'গুলো যে বিশুদ্ধ তা মনে প্রাণে মেনে নিতে হবে এবং তাকে এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা এক-অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর গুণেও এক, কর্মেও এক। আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যাবলী সম্পর্কে উপলব্ধি থাকতে হবে, আর নামসমূহ ধাবিত হবে এক অদ্বিতীয় সত্তার দিকে। তার অসংখ্য নাম কাউকে এ সন্দেহে যেন উপনীত না করে যে, এ নামগুলোর ভিন্ন ভিন্ন সত্তা রয়েছে। কারণ নামের ভিন্নতা সত্তার ভিন্নতা বুঝায় না।

তৃতীয় শর্ত: মুর্শিদ তথা আধ্যাত্মিক অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে এমন লোক হওয়া আবশ্যক। নফসের স্তর এর ব্যাধি ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা, শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার পদ্ধতি, আদম সন্তানের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তারের সুক্ষ্ম ব্যাপারগুলো এবং আল্লাহ অভিমুখে যাত্রা পথের বালা মুসিবত বাধা বিপত্তি ও এগুলো নির্ণয় পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে, যাতে করে যে কোন পরিস্থিতি আক্রান্ত বান্দাদের সংশোধন করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

চতুর্থ শর্ত: পীর-মুর্শিদ যিনি হবেন তাঁর জন্য আবশ্যক, তিনি যেন শাগরীদের তালিম-তরবিয়ত তথা তরিকতের শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার ব্যাপারে কামিল পীর-মুর্শিদের অনুমতি প্রাপ্ত হন (খেলাফত প্রাপ্ত হন)।

কোন ব্যক্তি যদি সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়ে তার জ্ঞান অর্জন হয়েছে বলে দাবি করে, আর এ ক্ষেত্রে যদি ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা তাকে স্বীকৃতি না দেয় ঐ বিষয়কে পেশা হিসেবে নেয়া কোন ক্রমেই তার জন্য বৈধ নয়।

কামিল পীর-মুর্শিদ উপযুক্ত শিষ্যকে সাধারণ মানুষকে দ্বীনী তালীম বা ত্বরীকৃতের শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার জন্য যে অনুমতি বা ইজাযাত কিংবা খেলাফত দান করেন, তা বর্তমান যুগে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তথা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের ন্যায়। অতএব চিকিৎসাশাস্ত্রের ডিগ্রি অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট ব্যতিত যেভাবে মানুষের চিকিৎসা করা যায় না, যেভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট ছাড়া বিল্ডিংয়ের প্লান করা যায় না, শিক্ষা বিভাগের সার্টিফিকেট ব্যতিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতা করা যাবে না, অনুরূপভাবে কামিল ও উপযুক্ত পীরের (যার খেলাফতের সিলসিলা রাসূল (দ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে) অনুমতি ও খেলাফত ব্যতিত নিজেকে পীর দাবি করা যাবে না।

বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের ক্ষেত্রে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা নেয়া যেমন অনুচিত, তেমনি কোন মুরিদের ক্ষেত্রেও কামিল পীরের খেলাফত নেই এমন স্বঘোষিত পীরের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ নয়। আমাদের পূর্বসুরী উলামায়ে কিরামের নিকট উস্তাদ বা শায়খের ইজাযত/সনদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এমনকি বিজ্ঞ উস্তাদের নিকট জ্ঞান অর্জন করে সনদ না নিয়ে শুধু পুস্তক অধ্যয়নে জ্ঞান অর্জন করা তাঁদের নিকট দোষনীয় ছিল। হযরত ইবনে সিরীন (রহ.) বলেছেন, 'নিশ্চয় এই জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে দ্বীন, তাই খুব বিচক্ষণতার সাথে খেয়াল করবে এই দ্বীন কার কাছ থেকে গ্রহণ করছ'।

রাসূলুল্লাহ (দ.) হযরত ইবনে উমার (রা.)কে অসিয়ত করেছেন 'হে ইবনে উমার! তোমার ধর্ম তোমার রক্ত মাংস (সবকিছু তোমার) অতএব অত্যন্ত সতর্কতায় তা গ্রহণ কর এমন ব্যক্তিদের থেকে যাঁরা দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী আর যারা অন্য দিকে ধাবিত হয়েছে তাদের কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ কর না'।

কোন মনীষী বলেছেন, জ্ঞান রূহ স্বরূপ যা অন্তকরণে ফুঁকে দেয়া হয়, আর কোন মাসয়ালা-মাসায়েল নয় যা পান্ডুলিপিতে কপি করা হয়। অতএব জ্ঞান অন্বেষণকারীর মাত্রই সতর্কতা

অবলম্বন করা দরকার, সে কার কাছ থেকে এই অমূল্য রত্ন গ্রহণ করছে, আর জ্ঞানীদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যে, তারা কাকে এই সম্পদ দিচ্ছে, কোন অপাত্রে যাচ্ছে কিনা?

আসল-খাঁটি পীরের পরিচয়:

* খাঁটি পীর-মুর্শিদের সান্নিধ্যে গেলে তথায় একটি ঈমানী পরিবেশ অনুভূত হবে, আত্মা সজিব হবে। তিনি কথা বলবেন শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে। তিনি শুধু কল্যাণের কথাই বলবেন, তাঁর আলোচনা নসিহতমূলক হবে, মানুষ তাঁর সান্নিধ্য থেকে, উপদেশ থেকে উপকৃত হয়। তাঁর সাথে সম্পর্ক থাকলে কাছে অথবা দূরে অবস্থান করলেও উপকৃত হয়, তাঁর সুহবাত এবং কালাম উভয়ই মুরিদের জন্য উপকারী।

* মুরিদ ও ভক্তদের মধ্যে সর্বদা ঈমানী যোশ পরিলক্ষিত হবে, তাদেরকে কাজ-কর্মে আচার-আচরণে নিষ্ঠাবান, তাকওয়াবান ও বিনয় প্রকাশ হবে। তাদের সাথে মেলামেশা করলে তাদের প্রেম ভালবাসা, সততা ত্যাগ ও নিষ্কলুষ ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। অভিজ্ঞতার আলোকে, যেভাবে ভাল ডাক্তারের পরিচয় পাওয়া যায় তদ্রুপ উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আসল পীর চেনা যায়।

ভক্ত-মুরিদের আধিক্য ও স্বল্পতা আসল ও নকল পীরের মাপকাঠি নয়, সেক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যে স্বীয় মুরিদকে সংশোধন করতে, তাদের অন্তকরণে খোদাভীতির বীজ বপন করতে, তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূল (দ.) প্রেমে উদ্ভাসিত করতে, দুনিয়ার মোহ-মায়া তথা যাবতীয় আত্মা রোগ থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে অটল রাখতে পেরেছেন কিনা?

* আসল পীরের ভক্ত-মুরিদকে বিভিন্ন স্তরের পাবে, যেভাবে রাসূল (দ.)-এর সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন স্তরের ছিলেন।

অতএব, সত্যান্বেষী মুমিনের প্রতি পরামর্শ থাকবে, কামিল পীরের সন্ধান পেলে তাঁর পবিত্র হস্তে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করবে, তাঁর সান্নিধ্যে আত্মনিয়োগ করবে, অত্যন্ত আদব-শিষ্টাচারের সাথে তাঁর সাথে উঠা বসা করবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আমল করবে, তাতে হবে উভয় জাহানের কামিয়াবী।

ইসলামী শরীয়তের আলোকে বায়াত: আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনে প্রত্যয়ী মুসলমানের ক্ষেত্রে আবশ্যক, সে যেন এমন কামিল পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, যিনি তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, আল্লাহ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে যাবতীয় বাধা ও অন্ধকার দূরীভূত করবেন, যাতে সে (মুরিদ) হিদায়াতের উপর অটল থেকে দৃঢ়তাসহ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে পারে।

পীর মুরিদকে বায়াত করবে মানে মুরিদ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিবে যে, সে (মুরিদ) পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের পথে অগ্রসর হবে এবং সে ক্ষেত্রে মুরিদ পীরের নির্দেশনানুযায়ী নিজেকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করবে এবং সুন্দর গুণাবলী দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করবে, দ্বীনের অন্যতম অপরিহার্য বিষয় ইহসানকে বাস্তবায়ন করবে এবং ক্রমান্বয়ে সূফীতত্ত্বের 'মাক্বামাত' (স্তরসমূহ)-এ উন্নীত হবে।

পীর-মুর্শিদের হাতে বায়াত হওয়ার বৈধতা কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনাদর্শ দ্বারা প্রমাণিত:

কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় যারা আপনার নিকট 'বায়াত' (আনুগত্যের শপথ করে) তারা তো আল্লাহর কাছেই বায়াত করেছে, আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে সেতো তা করবে নিজেরই অনিষ্টের জন্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন'। (ফাতাহ-১০)।

বাস্তবে বায়াত আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালা তা ভঙ্গ না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করত বলেছেন, 'যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর, তখন তা পূর্ণ কর এবং আল্লাহকে জামিন করে নিজেদের শপথ দৃঢ় করার পর তোমরা তা ভঙ্গ কর না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত'। (নাহল-৯১)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' (বনী ইসরাইল-৩৪)।

হাদীস শরিফে বায়াতের প্রমাণ: অঙ্গীকার নেয়া বা বায়াত গ্রহণ করা হাদীসে পাকে একই রূপে বর্ণিত হয়নি আর তা ছিল বিভিন্ন রূপে, কখনো বিভিন্ন দল উপদল বা ব্যক্তিকে উপদেশ এর সুরতে, আবার কখনো নারী পুরুষ বা ছোট শিশুদের বায়াত গ্রহণের সুরতে।

পুরুষদের বায়াত: ইমাম বুখারী (রা.) সহীহ বুখারী শরীফে হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন (সাহাবায়ে কিরামদের উদ্দেশ্যে) তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়াত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তোমরা একে অপরকে অপবাদ দেবে না ভাল কাজে অবাধ্য হবে না, তোমাদের মধ্যে যারা (এই অঙ্গীকার) পূর্ণ করবে তাঁর প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার নিকট অবধারিত। আর যে মন্দ কাজগুলোতে লিপ্ত হবে তাকে দুনিয়াতে দন্ডিত করা হবে তা তার জন্য কাফফারা, আর যে এই মন্দ কাজগুলোতে লিপ্ত। অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করেছেন তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হবে। তিনি যদি চান তাকে ক্ষমা করবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন শাস্তি দিবেন। "সুতরাং আমরা উপরোক্ত বিষয়ের উপর নবীজী (দ.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করলাম।"

কোন দল উপদলকে তলক্বীন বা উপদেশ নসীহত করার ব্যাপারে হাদীসে পাকের প্রমাণ: হযরত ইয়ালা বিন শেদাদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা শেদাদ বিন ওয়াইস (রা.) বলেন, আর তথায় হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.) উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তা সত্যায়িত করেন, 'একদা আমরা রাসূলাল্লাহ (দ.) এর নিকট ছিলাম তিনি (নবীজী (দ.)) বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ গরীব (অপরিচিত) আছ? অর্থাৎ আহলে কিতাব আছ? আমরা বললাম, না ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)। অতঃপর তিনি (দ.) দরজা বন্ধের নির্দেশ দিয়ে বললেন 'তোমরা হাত উঠাও এবং বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অতএব আমরা হাত উঠালাম এবং বললাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এরপর তিনি (দ.) বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। হে আল্লাহ তুমি আমাকে এই কালিমার সহিত প্রেরণ করেছ এবং এর (এই কালিমা পাঠের এবং বাস্তবায়নের) নির্দেশ দিয়েছ এবং এর (এই কালিমায় অটল থাকার শর্তে) বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছ। আর নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। অতঃপর নবীয়ে করীম (দ.) বলেন, আমি কি তোমাদের এ সুসংবাদ দিব না যে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন'।

ব্যক্তি বিশেষকে নসীহত বা তলক্বীনের ব্যাপারে হাদীস শরীফের প্রমাণ: একদা হযরত আলী (রা.) নবীয়ে করীম (দ.)কে এ বলে আরয করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! আমাকে এমন পথ দেখান, যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার অত্যন্ত নিকটবর্তী বান্দার জন্য সহজ এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদা পূর্ণ। জবাবে নবীয়ে করীম (দ.) বলেন, তুমি সদা সর্বদা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাক। হযরত আলী (রা.) আবার আরয করলেন, সব লোকইতো যিকির করে আমাকে একটি বিশেষ যিকির দ্বারা ধন্য করুন, রাসূলুল্লাহ (দ.) বললেন, 'আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আর যদি আসমান এবং যমিন এক পাল্লায় হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরেক পাল্লায় হয় এ পাল্লাটি অবশ্যই ভারী হবে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার লোক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না' তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিভাবে যিকির করব? নবীয়ে করীম (দ.) বললেন, তোমার উভয় চোখ বন্ধ এবং আমার কাছ থেকে তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শুন, অতঃপর তা তুমি তিন বার বল এবং আমি তা শুনব, এরপর তিনি তা উচ্চ আওয়াজে করেছেন।

ব্যক্তি বিশেষকে তলক্বীন বা দীক্ষা দেয়ার প্রমাণ: ইমাম তিবরানী 'আল আওসাতে' ইমাম আবু নাঈম, ইমাম হাকিম নিশাপুরী, ইমাম বায়হাকী, ইমাম ইবনুল আসাকীর (রা.) হযরত বশির বিন আল খাসাসিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (দ.) এর নিকট আসলাম তাঁর (দ.) নিকট বায়আত গ্রহণ করার জন্য, অতএব বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী কী শর্তে আপনি আমাকে বায়আত করাবেন? তখন রাসূল (দ.) স্বীয় হাত মোবারক বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, এই মর্মে সাক্ষী দাও যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক সত্তা তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর মুহাম্মদ (দ.) তাঁর প্রিয় বান্দা এবং রাসূল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে পড়বে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানে রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব পালন করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।' তখন আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! উপরোক্ত বিষয়সমূহে সবগুলোই পারব কিন্তু দু'টি বিষয় পারব না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যাকাত, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার নিকট দু'টি বাচ্চা উট ছাড়া আর কিছুই নেই আর এগুলো হচ্ছে আমার পরিবারের ভরণ পোষণ। আর অন্যটি হচ্ছে জিহাদ (তাও পালন করতে পারব না), কারণ আমি খুব ভীতু লোক, যারা যুদ্ধ থেকে পিছু হটে যায় তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়, অতএব আমি ভয় করছি যে, যদি আমি যুদ্ধে যাই এবং

প্রাণের ভয়ে পিছু হটে যাই তবে আমি আল্লাহর ক্রোধের শিকার হব (নাউজুবিল্লাহ)। অতঃপর রাসূল (দ.) তাঁর হাত ধরলেন এবং তা সজোরে নাড়া দিলেন আর বললেন, হে বশির! সাদকাও দিবে না! জিহাদও করবে না! তবে তুমি কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে? তখন আমি (বশির) বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! আপনার হাত মোবারক প্রসারিত করে দিন, আমি বায়াত হব। অতঃপর রাসূল (দ.) স্বীয় হাত মোবারক প্রসারিত করলেন, আমি উল্লেখিত শর্তে তাঁর নিকট বায়াত হলাম।

হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী (দ.)কে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)! আপনি আমাকে বায়াত করুন আর বায়াতের শর্ত সম্পর্কে আপনিই ভাল জানেন, তখন রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, 'আমি তোমাকে এই মর্মে বায়াত করাচ্ছি যে, তুমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরিক করবে না, নামায পড়বে, যাকাত দিবে, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করবে এবং শিরিক থেকে মুক্ত থাকবে।'

হযরত জরীর (রা.) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ (দ.) এর নিকট বায়াত হয়েছি নামায পড়া, যাকাত দেয়া ও প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার শর্তে'। (বুখারী শরীফ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (দ.) এর নিটক বায়াত হতাম তাঁর (দ.) আনুগত্যের শর্তে, তখন তিনি (দ.) আমাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তোমাদের সাধ্যানুসারে। (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদিস শরীফে মহিলাদের বায়াত: হযরত সালমা বিনতে কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত (তিনি নবীজী (দ.) এর খালাদের একজন রাসূল (দ.) এর সাথে উভয় ক্বিবলায় নামায পড়েছেন, (তিনি বনী আদি ইবনে নাজ্জারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (দ.) এর খিদমতে আসলাম অতঃপর আনসারী মহিলাদের সাথে নবীজীর (দ.) নিকট বায়আত গ্রহণ করেছি। অতএব নবী করীম (দ.) আমাদেরকে এই মর্মে বায়াত করালেন যে আমরা যেন আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরিক না করি, চুরি না করি, যিনা না করি, আমাদের সন্তানদের হত্যা না করি, কারো চরিত্রে অপবাদ না দিই আর কোন ভাল কাজে যেন নাফরমানী না করি। তিনি (দ.) আরো বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্বামীদের ধোকা দিবে না' তিনি (হযরত আসমা রা.) বলেন, আমরা সবাই তাঁর (দ.) নিকট বায়াত গ্রহণ করলাম অতঃপর ফিরে আসলাম। তখন আমি বায়াত গ্রহণকারী মহিলাদের একজনকে বললাম নবীজী (দ.) এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, স্বামীর সম্পদ হতে আমাদের উপর কোন জিনিস হারাম? মহিলা বলেন, আমি নবীজী (দ.)কে জিজ্ঞাস করেছি তিনি (দ.) বলেন, স্বামীর অনুমতি ব্যতিত তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দেয়া'। (মুসনাদে ইমাম আহমদ (রা.) আবু ইয়ালা, তিবরানী, মাজমাউজ যাওয়ায়িদ)

উমাইমা বিনতে রাক্বিকা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নারীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (দ.) এর নিকট আসলাম, অতঃপর বললাম 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (দ.) আমরা আপনার নিকট এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করব না, চুরি করব না, যিনা করব না, আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না, কারো চরিত্রে অপবাদ দিব না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্য হব না। তখন রাসূল (দ.) ইরশাদ করলেন, এ গুলোর মধ্যে যা তোমাদের শক্তি-সামর্থ ও সাধ্যের মধ্যে আছে তা তোমরা পালন করবে, আমরা বললাম আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি অতিশয় দয়াবান, ইয়া রাসূলুল্লাহ (দ.)! আমাদেরকে এখনই বায়াত করান, তিনি (দ.) বললেন, আমি নারীদের সাথে মুসাফাহা করব না, একশ মহিলাদের জন্য আমার যে কথা একজনের জন্যও আমার সে কথা। (তিরমিজী ও নাসায়ী শরীফ)।

হযরত উমাইমা বিনতে রাক্বিকা (রা.) নবীয়ে করীম (দ.) এর নিকট ইসলাম ধর্মের বায়াত গ্রহণের জন্য এসেছিলেন, তখন নবীয়ে করীম (দ.) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বায়াত করাচ্ছি যে, তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরিক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমার সন্তানকে হত্যা করবে না, কাউকে চারিত্রিক অপবাদ দিবে না, জাহেলী যুগের সব অপকর্ম ত্যাগ করবে। (নাসায়ী, তিরমিজী)

হযরত আজ্জা বিনতে খায়িল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবীয়ে করীম (দ.) এর নিকট আসলেন, অতঃপর নবীজী (দ.) তাকে বায়াত করালেন এই মর্মে যে, 'তুমি যিনা করবে না, চুরি করবে না, প্রকাশ্যে-গোপনে জ্যান্ত সন্তান হত্যা কর না', আমি বললাম প্রকাশ্যে সন্তান হত্যার ব্যাপারটি গোপনে সন্তান হত্যার ব্যাপারটি নবীজী (দ.) এর নিকট জিজ্ঞেস করিনি, তা তিনি (দ.) আমাকে অবগতও করেন নি, কিন্তু

আমার মনে হল এর দ্বারা তিনি (দ.) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে সন্তান নষ্ট করাকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি কোন সন্তান নষ্ট করিনি। (তিরমিজী, আওসাত ও কবীর, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ)

নাবালেগ বাচ্চাদের বায়াত: হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম (দ.) হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.)কে বায়াত করেছেন, তখন তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, তাঁদের দাঁড়ি উঠেনি এবং তাঁরা বালিগ হননি। (তিরমজী, মাজমাউজ যাওয়ায়িদ)।

ইমাম তিবরানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উভয়ে নবীজী (দ.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন, এমতাবস্থায় তাঁরা উভয়ে সাত বছরের কিশোর, যখন নবীয়ে করীম (দ.) তাদের উভয়কে দেখলেন তখন মুচকি হাসলেন এবং স্বীয় হাত বাড়িয়ে দিলেন, অতঃপর উভয়কে বায়াত করালেন। (মাজমাউজ জাওয়ায়িদ)

সারকথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন অবস্থায় নবীজী (দ.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করতেন। তাঁরা বায়াত করতেন দ্বীন ইসলামের উপর, ইসলামী অনুশাসন অনুশীলনের উপর, হিজরত করার উপর, দ্বীনের সাহায্যের উপর, জিহাদের উপর, মৃত্যুর ব্যাপারে আনুগত্য ও অনুসরণের উপর।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর বায়াত (নবীজী (দ.) এর খলিফাগণ): আল্লামা ইবনে শাহিন, ইব্রাহিম ইবনে মুনতাসির, তিনি তার পিতা, তার পিতা তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'বায়াতের আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় 'নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বায়াত হয়েছেন তারা অবশ্যই আল্লাহর নিকট বায়াত হয়েছেন'। (ফাতাহ-১০)। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজী (দ.) এর নিকট বায়াত হওয়ার ধরন ছিল যত সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর ওয়াস্তে সত্যিকারের আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করতেন, তা ছিল নিম্নরূপ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর বায়াত ছিল (তিনি বলতেন) 'যে সমস্ত বিষয়ে আমি আল্লাহর আনুগত্য করি ওইসব বিষয়ে তোমরা আমার নিকট বায়াত গ্রহণ কর এবং হযরত উমর (রা.) ও তাঁর পরবর্তীদের বায়াতের ধরন ছিল নবীজী (দ.) এর বায়াতের মত।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি মদিনায় গেলাম তখন হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তিকাল করেন এবং হযরত উমর (রা.) তাঁর খলিফা হন, আমি হযরত উমর (রা.)কে বললাম আপনার হাত বাড়িয়ে দিন আমি আপনার নিকট বায়াত হব সাধ্যমত আনুগত্যের যেভাবে আপনি হযরত আবু বকর (রা.) নিকট বায়াত হয়েছেন। হযরত সোলাইমান আবু আমের (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'হামরার প্রতিনিধি দল হযরত উসমান (রা.) এর নিকট আসেন, অতঃপর এই মর্মে বায়াত করেন যে, তারা কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, মজুসিদের ঈদ পরিত্যাগ করবে, যখন তারা হ্যাঁ বলল, তখন তিনি তাদেরকে বায়াত করালেন। অতঃপর সূফীতত্ত্বের অনুশীলনকারী পীর-মুর্শিদগণ যুগে যুগে মানুষকে বায়াত করার ক্ষেত্রে নবীজী (দ.) এর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যেমন আবুল হাসান নদভী তার رجال الفكر والدعوة في الاشياء নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'নিশ্চয় হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রা.) বায়াত ও তাওবার পথ উন্মুক্ত করেছেন। মুসলিম বিশ্বের দিগ দিগন্ত থেকে অকাতরে মানুষ তাঁর ত্বরিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা আল্লাহর সহিত তাদের প্রতিশ্রুতি নবায়ন করেছেন, তাঁরা তাঁর নিকট এই মর্মে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন যে তাঁরা আল্লাহর সাথে কোন শরিক করবেন না, কুফুরী করবেন না, পাপাচারে লিপ্ত হবেন না, বিদআত করবেন না, জুলুম করবেন না, আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তা হালাল মনে করবেন না, আল্লাহ তায়ালা যা ফরয করেছেন, তাঁরা তা ত্যাগ করবেন না, তাঁরা দুনিয়াদারীতে মিশে যাবেন না, আখিরাতকে ভুলে যাবেন না। আল্লাহ তায়ালা হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রা.)এর হাতে এত অসংখ্য মানুষের আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়েছেন যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতিত আর কেউ জানেন না, তাঁর বদৌলতে অসংখ্য মানুষের অবস্থা সংশোধিত হয়েছে, তাঁদের ইসলামের অনুশীলন যথার্থ হয়েছে, তাঁদেরকে তিনি যথাযথ দীক্ষা দিয়েছেন তাদের সঠিক পর্যবেক্ষণ করেছেন, তত্ত্বাবধান করেছেন। অতএব তাঁর পরবর্তীতে তাঁর রূহানী শিষ্যরা বায়াত, তাওবা ও ঈমান-আক্বিদার ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এই গুরু দায়িত্ব পালন করেন। আর একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের আত্মশুদ্ধি, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে আমূল পরিবর্তনে এই বায়াতের ভূমিকা বা প্রভাব অপরিসীম।

সাংগঠনিক কার্যক্রম

মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর ৫ম জাতীয় সূফি সম্মেলন সম্পন্ন

'বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ সুফিবাদ' এ মটো নিয়ে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনায় ও মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর উদ্যোগে গত ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী '৫ম জাতীয় সূফি সম্মেলন' উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব শাবান মাহমুদ। অতিথি ছিলেন চ.বি. ফলিত ও পরিবেশ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ হেলাল উদ্দীন, রসায়ন বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক ড. মোঃ ইসমাঈল হোসেন, এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট সচিব এ এন এম এ মোমিন, সূফিতাত্ত্বিক গবেষক ড. সেলিম জাহাঙ্গীর। অধ্যাপক ড. মোঃ হেলাল উদ্দীন-এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সম্মেলনের কো-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সূফিবাদের বিকল্প নেই। সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস মোকাবিলায় সূফিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। তিনি ইসলামের প্রচার প্রসার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর প্রশংসা করেন। এ সম্মেলন মানুষের মধ্যে নতুন করে প্রেরণা সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ ও জংগীবাদের বিপরীতে সুফিবাদই মানব জাতিকে শান্তির পথ দেখাতে পারে। অনুষ্ঠানে গজলশিল্পী এম. শাহজাহান আলীর উপস্থাপনায় মরমী লেখকদের গানের সমন্বয়ে সংগীত আলেখ্য পরিবেশন করা হয়।

উভয় দিনের সম্মেলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার সূফি সাধক, শিক্ষাবিদ, ওলামা-মাশায়িখ, লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, পেশাজীবী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ ও প্রবন্ধকার:

১) বিশ্ব সংকট নিরসনে সূফিবাদের ভূমিকা- প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২) তাসাউফের আলোকে জাতীয় কবি নজরুল - ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সুফিতাত্ত্বিক গবেষক ৩) শাহ্ সুলতান রুমী (র.) ও নেত্রকোণায় ইসলাম - ড. আবু সালেহ সেকেন্দার, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ৪) The influence of Sufis in the sultanate Administration of Bengal - মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ৫) যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ জাগরণে সূফিবাদের ভূমিকা- ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, সহকারী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৬) সূফিবাদের ক্রমবিকাশের ধারায় মাইজভাণ্ডারী তরিকা- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর। ৭) সুফিবাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য - জনাব জহুরুল আলম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, হাটহাজারী কলেজ, চট্টগ্রাম ৮) সুফিবাদ ও অন্যান্য মরমী দর্শন ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা - প্রফেসর ড. এম. শফিকুল আলম, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৯) ইবাদত তথা ধর্মের দু'টি দিক ঃ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে ঐশী নির্দেশনা - ডা. এ এন এম এ মোমিন ১০) প্রখ্যাত সুফিদের জীবনী ও শিক্ষা - ড. মোঃ নুরে আলম, সহকারী অধ্যাপক, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১১) বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সুফিবাদের ভূমিকা - জনাব মোস্তাক আহ্মাদ, লেখক ও সুফিতাত্ত্বিক গবেষক ১২) বাংলাদেশে সুফিবাদ - ড. এফ, এম, এনায়েত হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মার্চ মাসের নিউজপুল থেকে

আলোকধারা ডেস্ক

ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের বাড়ি ঘর ধ্বংস:

ইসরাইল পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরের দক্ষিণে একটি স্কুলসহ ফিলিস্তিনিদের ৪১টি বাড়িঘর ও প্রতিষ্ঠান বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। ২০১৬ সালের শুরু থেকে ইসরাইলি বাহিনী গড়ে প্রতি সপ্তাহে ফিলিস্তিনিদের ২৯টি বাড়ি ধ্বংস করছে। মার্চের ১ম সপ্তাহে ইসরাইলি বাহিনীর এই উচ্ছেদ অভিযানে ১৮টি ফিলিস্তিনি পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে বলে জাতিসংঘ রিপোর্টে জানা গেছে।

খাদ্যদ্রব্যে চিনির পরিবর্তে বিষাক্ত ঘনচিনির ব্যবহার:

চট্টগ্রামে সাধারণ চিনির নামে মিষ্টি, বেকারি আইটেম, আইসক্রিম, বেভারেজ, জুস, চকলেট, কন্ডেন্সড মিল্কসহ বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যে মেশানো হচ্ছে মানুষের জীবনঘাতি ঘনচিনি। ঘনচিনির নামে যেসব উপাদান মেশানো হচ্ছে তা হচ্ছে বিষাক্ত রসায়নিক ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, সাইট্রিক এসিড সোডিয়াম সাইট্রেট।

অধিক মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীরা এ অনৈতিক কাজ করছেন। কারণ একটি পণ্য তৈরিতে যেখানে ৫০ কেজি সাধারণ চিনির প্রয়োজন সেখানে এক কেজি ঘনচিনিই যথেষ্ট। এদিকে আবার ঘনচিনিকে ভেজাল করা হচ্ছে নানাভাবে। সাধারণ বাজারে এক কেজি ঘনচিনির দাম ২২০ টাকা। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ভেজাল ঘনচিনি বিক্রি হয় ১৪০ টাকায়। আসলে ঘনচিনির নামে ১৪০ টাকায় যা বিক্রি হয় তা মূলত ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সার। যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল:

সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের অন্তর্ভুক্তির বিধান চ্যালেঞ্জ করে ২৮ বছর আগে দায়ের হওয়া একটি রিট আবেদন খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। বিচারপতি নাঈমা হায়দার নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ ২৮ মার্চ ২০১৬ রুল নিষ্পত্তি করে এ রায় দেন। বেঞ্চের অপর দু'সদস্য হলেন– বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল।

ব্যয়বহুল স্বাস্থ্য পরীক্ষা:

দেশে খাদ্যে ভেজাল একটি স্বীকৃত বিষয়। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের রোগ-শোক। সাথে বাড়ছে চিকিৎসা ব্যয়। তন্মধ্যে রয়েছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের উচ্চ ফি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিপুল ব্যয়। এ সুযোগে গড়ে উঠছে বিভিন্ন বেসরকারী ডায়াগনষ্টিক সেন্টার। এক সমীক্ষায় জানা গেছে বেসরকারী ডায়াগনষ্টিক সেন্টারসমূহে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যয় নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে দুই থেকে দশগুণ বেশি। সংশ্লিষ্টদের মতে, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দুর্বল মনিটরিং, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা এবং এক শ্রেণীর চিকিৎসকের 'কমিশন বাণিজ্যের' কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের শিকার হচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ।

দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে:

দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেশে কর্মক্ষম ২৬ লাখ ৩০ হাজার মানুষ বেকার। এর মধ্যে পুরুষ ১৪ লাখ, নারী ১২ লাখ ৩০ হাজার। যা মোট শ্রমশক্তির সাড়ে চার শতাংশ। তিন বছর আগে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ ৯০ হাজার। এক দশক আগে ছিল ২০ লাখ। বিশ্ব ব্যাংক মনে করে, সরকারীভাবে এ সংখ্যা কম দেখালেও প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। এর ওপর প্রতি বছর নতুন করে ১৩ লাখ মানুষ শ্রম বাজারে যোগ হচ্ছে। যে কারণে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির চাপ রয়েছে অর্থনীতির ওপর। সংস্থাটির মতে, বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের হার ২ শতাংশ বাড়ানো গেলে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত হবে।

বর্তমানে সরকারী চাকরিতে প্রবেশের বয়স সীমা ৩০ বছর। বিভিন্ন সেশনজট ও গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর দাবী উঠলেও সরকারী চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ছেনা। সরকারী নিয়ম অনুসরণ করার ফলে বেসরকারী ব্যাংকসহ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও ৩০ বছরের উর্দ্ধে জনবল (অভিজ্ঞতা ছাড়া) নিয়োগ দেয় না।

৫ম জাতীয় সুফি সম্মেলন ২০১৬-এ একাডেমিক সেশনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল' কর্তৃক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বৃত্তি প্রদান করছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ও কাউন্সিলর মোঃ নাজমুল হক ডিউক।

গত ৯ মার্চ ২০১৬ নগরীর বিবিরহাটস্থ এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তনে মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত "তাসাওউফ সাহিত্যে হাদিসের ব্যবহার এবং এ সম্পর্কিত অভিযোগ সমূহের পর্যালোচনা" শীর্ষক রুহানী সংলাপে বক্তব্য রাখছেন চ.বি. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মোরশেদুল হক ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যক্ষ গোলাম মোহাম্মদ খান সিরাজী।

গত ২৬ মার্চ শনিবার এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় মাইজভাণ্ডার শরিফস্থ হোসাইনী ক্লিনিকে দুঃস্থ শিশুদের বিশেষ খৎনা কার্যক্রমে ব্যস্ত চিকিৎসকগণ।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

১. **মাদ্‌রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (আলিম),** মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
২. **উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফ্‌যখানা,** মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
৩. **গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্‌স্টিটিউট,** চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৪. **শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল,** শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৫. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী,** হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
৬. **শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ইসলামি একাডেমি,** হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৭. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া ও নূরানী মাদ্‌রাসা,** সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৮. **বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা,** হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
৯. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হিফ্‌যখানা ও এতিমখানা,** মনোহরদী, নরসিংদী।
১০. **জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি,** পূর্ব লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১১. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী,** সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৩. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী,** বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৪. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৫. **মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী,** খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৬. **জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও ইবাদাতখানা,** চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৭. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৮. **জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** এয়াকবুদণ্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৯. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
২০. **হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্‌রাসা, নূর আলী মিয়া হাট,** ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২১. **শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা,** চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২২. **মাইজভাণ্ডার শরিফ গণপাঠাগার।**

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প:

- হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।

দরিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- যাকাত তহবিল।
- দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী একাডেমি।
- মাসিক আলোকধারা।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
- মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প:

- **দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী,** মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- **দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদাতখানা,** নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথা।
- **দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী,** শান-ই-আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।
- **ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।**